১১শ বর্ষ ১ম সংখ্যা
বৈশাখ - শ্রাবণ ১৪২৮

বায়োন মন্দিরশিখর, সিয়েম রিপ, কাম্বোডিয়া - আলোকচিত্রী মলয় সরকার

আমাদের ছুটি – ৩৭শ সংখ্যা

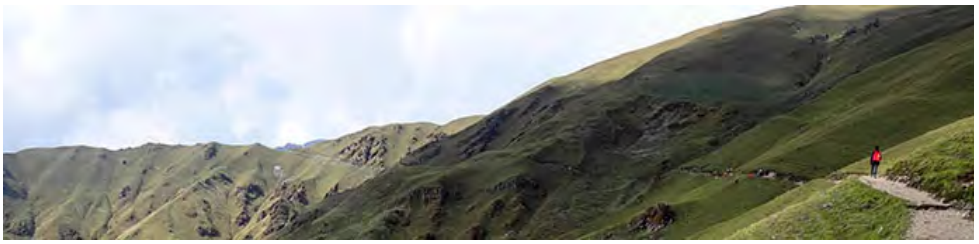

বেড়ানোর কথা আর ছবি নিয়ে বাংলা ই-ম্যাগাজিন

আমাদের বাংলা | আমাদের দেশ | আমাদের পৃথিবী | আমাদের কথা

১১শ বর্ষ ১ম সংখ্যা
বৈশাখ - শ্রাবণ ১৪২৮

২০১১- এর মে থেকে ২০২১- এর মে – দেখতে দেখতে দশটা বছর পেরিয়ে এল ' আমাদের ছুটি' । যে পাঠক- লেখকদের সহযোগিতা ও আগ্রহে এটা সম্ভবপর হয়েছে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই তাঁদের। গত দশ বছরে তিনশোর বেশি ভ্রমণকাহিনি আর বেশ কয়েক হাজার আলোকচিত্র প্রকাশিত হয়েছে এই আন্তর্জাল পত্রিকামাধ্যমে। এই পত্রিকা প্রকাশের পিছনে আমাদের উদ্দেশ্য ছিল শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠিত লেখকদের কাহিনিপ্রকাশের মাধ্যম নয়, 'আমাদের ছুটি' হবে পাঠকদের নিজস্ব পত্রিকা, অর্থাৎ সাধারণ পাঠক যাঁরা এতদিন বেড়াতে যেতেন, ফিরে এসে হয়তো কাছের মানুষদের কাছের সেই বেড়ানোর গল্প করতেন, কিন্তু সেই কাহিনি লিখে পরিচিতের গণ্ডির বাইরে আরো অনেককে জানানোর কথা কল্পনাও করতেন না, 'আমাদের ছুটি' হবে তাঁদের লেখকসত্তাকে জাগিয়ে তোলার মাধ্যম এবং তার পাশাপাশি এদেশ আর পড়শি দেশ তো বটেই বিশ্বজুড়ে ছড়িয়েছিটিয়ে থাকা বাংলাভাষীদের প্রবাসকাহিনি জানানোর একটা প্ল্যাটফর্ম। আজ আনন্দ লাগে এটা ভেবে যে বাস্তবে হয়েছেও তাই। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আপনারা নিয়মিত লেখা পাঠিয়ে চলেছেন তো বটেই, প্রতিবছরই অনেক নতুন ভ্রমণলেখকও উঠে এসেছেন 'আমাদের ছুটি'- র হাত ধরে। তাঁদের কেউ রয়ে গিয়েছেন কেউবা অন্য কোনও পত্রপত্রিকায় লিখছেন ইদানীং। আবার কেউকেউ শুধুমাত্র 'আমাদের ছুটি'তেই একটি বা দুটি ভ্রমণকাহিনি লিখে থেমে গেছেন। তবু পত্রিকার প্রতি সংখ্যাতেই এক বা একাধিক নতুন মুখকে তাঁর কাহিনি বলার সুযোগ করে দিতে পেরেছে 'আমাদের ছুটি'।

ইতিমধ্যে বিশ্বের নানান দেশ অনেকটা সামলে উঠলেও করোনা মহামারীর কোপে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের সাম্প্রতিক অবস্থা বেশ খারাপ। প্রায়ই কাছের- দূরের পরিচিতজনের মৃত্যুসংবাদ এসে পৌঁছাচ্ছে। অতিমারীর প্রভাবে বেড়াতে যাওয়া ক্রমশ যেন একটা কাল্পনিক বিষয় বলে মনে হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই তার প্রভাব এসে পড়ছে 'আমাদের ছুটি'- র ওপরেও। সাম্প্রতিক ভ্রমণকাহিনির অপ্রতুলতায় পত্রিকার যথাসময়ে প্রকাশেরও একটা বাধা তৈরি হচ্ছে।

আমাদের নতুন এবং পুরোনো লেখকদের জানাই, সময়- সুযোগ করে পুরোনো বেড়ানো নিয়েই নতুন লেখা লিখুন আর পাঠিয়ে দিন আমাদের ই- মেইল- এ। আর পাঠকদের কাছে আরেকবার বলা, অবসরে মানসভ্রমণের জন্য 'আমাদের ছুটি' রয়েছে আপনাদের হাতের একটা ছোঁয়ার দূরত্বেই।

সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। তাড়াতাড়ি কেটে যাক এই দুর্দিন... "মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জরা, অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা"। আরো বেড়ে উঠুক 'আমাদের ছুটি' সুখে- দুঃখে।

- **দময়ন্তী দাশগুপ্ত**

- এই সংখ্যায় –

"চলার পথ সবসময় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল না, একটু পরপরই কুয়াশায় ঢেকে যেতে থাকল। আবার কখনও আন্দাজে পায়ে চলা পথ অনুসরণ করে এগিয়ে যেতে থাকলাম। প্রায় ঘন্টাদুয়েক এভাবে চলার পর সামনে দেখতে পেলাম অনেকটা ফাঁকা জমি, পুরোটাই ঘাসে ঢাকা। আরেকটু ভালো করে দেখে বুঝলাম এটা আসলে ঘাসেঢাকা পাহাড় - একেই বলে বুগিয়াল। কিন্তু এত বড় জায়গা জুড়ে এরকম গাছপালাহীন শুধু ঘাসেঢাকা পাহাড় থাকতে পারে আমার কল্পনায়ও কখনো আসে নি।"

শুরু হল সুদীপ্ত দত্তের ট্রেকিং-এর কাহিনি "নন্দাকিনীর উৎসমুখে"

~ আরশিনগর ~

একা একা, ঘুরেঘারে, হীরাবন্দরে
– তপন পাল

~ সব পেয়েছির দেশ ~

পেলিং-এ তিনদিন – সৌমী নাগ

আমাদের ছুটি – ৩৭শ সংখ্যা

লাজবাব লাচুং – অরিন্দম পাত্র

~ ভুবনডাঙা ~

ভিয়েনা – এক ঐতিহ্যমণ্ডিত আভিজাত্য – কণাদ চৌধুরী

ভাঙা মন্দিরের দেশ কাম্বোডিয়া (২য় কিস্তি) – মলয় সরকার

~ শেষ পাতা ~

শঙ্করপুরে একদিন – সৌমেন্দ্র দরবার

ছোট্ট ছুটিতে দিঘায় – পঙ্কজ দত্ত

For any queries/complaints, please contact amaderchhuti @gmail.com
© 2011 - 2021 AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu

নন্দাকিনীর উৎসমুখে

সুদীপ্ত দত্ত

~ *রন্টি স্যাডেল ট্রেক রুটম্যাপ* // *রন্টি স্যাডেল ট্রেকের আরও ছবি* ~

যাত্রাপথে নতুন বন্ধুরা

"যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে..." তবে আর কী? অন্যের পথ অনুসরণ করে তার হাত ধরেই এগিয়ে চলো! ব্যাপারটা অনেকটা এরকমই হয়েছিল বছর তিনেক আগে ২০১৭-এর সেপ্টেম্বরের শেষে। চেয়েছিলাম পুজোর ছুটিতে অরুণাচলের একটি অল্পপ্রচলিত ট্রেকরুটে পায়ে হাঁটব, কিন্তু সঙ্গী জোগাড় করতে পারলাম কই? বন্ধুদের কেউ ছুটি ম্যানেজ করতে পারে না, আবার কেউ বা খরচাপাতির বহর শুনে পিছিয়ে যায়। এদিকে "ইউথ হোস্টেলস"-এর পুরনো বন্ধুরা রূপকুণ্ডে যাওয়ার কথা বললেও ততক্ষণে আর কোনও আসনই খালি ছিল না। তাই অফিস কলিগ মানবদা যখন "রন্টি স্যাডেল" যাওয়ার কথা পাড়ল আমি যেন হাতে চাঁদ পেলাম। মানবদাদের একটা ট্রেকিং টিম রয়েছে, ক'দিন পরপরই ওঁরা বেড়িয়ে পড়েন পাহাড়ের রাস্তায়। ভিড়ে গেলাম সেই দলে। কথা ছিল ছয়জনের দল নিয়ে রওনা হব, কিন্তু হাওড়া স্টেশনে গিয়ে দেখি লোক কমে মাত্র চার। তার মধ্যে দাঁতের ব্যথায় কাবু মানবদা চলছে অ্যান্টিবায়োটিক আর মনের জোরের ওপর ভরসা করে! দলের ক্যাপ্টেন সুখেনদা একাই একশো, অনেক ট্রেকের অভিজ্ঞতা থাকায় চেনাপরিচিতিও অনেক। তাই ট্রেকের প্ল্যানিং, গাইড থেকে শুরু করে যাতায়াত বা থাকা খাওয়ার কোনও ব্যাপারে আমাদের বিন্দুমাত্র চিন্তা করতে হল না। আর অন্য সাথী বাবুদা যেন হাশিখুশির ফোয়ারা। এরকম মানুষ ছাড়া একটা বড়সড় ট্যুর চিন্তাও করা যায় না। বয়সে ছোট হওয়া সত্ত্বেও পঞ্চাশ পেরোনো তিনজনের দলে কখন যে মিশে গেলাম টেরই পেলাম না।

পাহাড়ি জঙ্গলি পথ আর "রাত কি রানি"

হাওড়া থেকে উইকলি লালকুঁয়া এক্সপ্রেস, ট্রেন হিসেবে খুব একটা মন্দ নয়, মোটামুটি পাংচুয়াল। তার ওপর স্লিপারে কাটা টিকিট অটো-আপগ্রেডেশনে এসি হয়ে যাওয়ায় লটারিতে প্রাইজ জেতার মত একটা অনুভূতি হতে শুরু করল। ওরা পুষ্টি আর স্বাদ সবকিছুর কথা মাথায় রেখে অল্প তেলে ভাজা পরোটা আর সন্দেশ সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছিল, চব্বিশ ঘন্টার ট্রেন জার্নিতে তাই কখনোই খালি মুখে বসে থাকতে হল না। লালকুঁয়া পৌঁছতে পরদিন বেলা এগারোটা, হাতে সময় খুব কম, তাই বুক করে রাখা গাড়ি স্টেশনে আসতেই রওনা দিয়ে দিলাম লোহাজংয়ের দিকে। কিন্তু সময় বাঁচাবো বললেই তো আর সময় বাঁচে না, ট্রেন থেকে নেমে খিদে পেটে আর কতদূর যাওয়া যায়। হল্দোয়ানির কাছাকাছি পৌঁছে একটা রেস্টুরেন্টে খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হল। রেস্টুরেন্টটা একটা পাহাড়ের ধাপে বানানো হয়েছে, একটু নিচে গোলা নদী বয়ে চলেছে, আর তার পাশে তৈরি হয়েছে বৈষ্ণোদেবীর মন্দির আর একটা মঠ। দেবভূমি উত্তরাখণ্ডে মন্দির দর্শন হবে না এটাও কি সম্ভব? খাওয়াদাওয়া করে আবার লম্বা পথে পাড়ি দিলাম। কিছুটা যেতেই গোমতী নদী আমাদের সঙ্গী হল। নৈনিতাল, আলমোড়া, কৌশানি হয়ে গোয়ালদাম পৌঁছলাম রাত আটটায়। এরপরে রয়েছে জঙ্গলের পথ। রাতের অন্ধকারে সে পথে যাওয়া কতটা যুক্তিযুক্ত হবে সেই ভাবনা মাথায় এলেও সাহসে ভর করে এগিয়ে চললাম পাহাড়ি পথ ধরে। রাস্তা ততটা ভাঙাচোরা নয় কিন্তু আঁকাবাঁকা আর প্রতিটা বাঁকের ওপারেই রয়েছে গভীর খাদ। পাহাড়ি জঙ্গলে গাড়ির হেডলাইটে মাঝে মাঝেই নজরে পড়তে লাগল শেয়াল আর বুনো খরগোশ। বনের রাস্তায় চলতে চলতে মিষ্টি একটা সুগন্ধ টের পেলাম। ড্রাইভারকে জিগ্যেস করলাম "এটা কিসের গন্ধ?" জানালো "ওহ রাত কি রানি হ্যায়"। রাতের জুঁই বা হাসনুহানাকে এরা এই নামেই ডাকে। সমতল থেকে যত ওপরে উঠতে লাগলাম ঠাণ্ডাটাও জাঁকিয়ে বসতে লাগল। লোহাজং পৌঁছাতে পৌঁছাতে রাত তখন দশটা। আমাদের থাকা, খাওয়া-দাওয়া আর পুরো ট্রেকের দায়িত্ব ছিল দেব-এর কাঁধে। এখানকার নামকরা গাইড। ক্যাপ্টেনের সঙ্গে পরিচয় বহুদিনের। বেশ কয়েকটা ট্রেকে মানবদাদের সঙ্গী ছিল দেব। লোহাজং পৌঁছতেই দেখা হয়ে গেল ওর সঙ্গে। ট্রেকারদের জন্য একটা গেস্ট হাউস রয়েছে, দেব আগেই সেখানে আমাদের থাকার বন্দোবস্ত করে রেখেছিল। দোতলার একটা বড় ঘরে আমাদের রাত কাটানোর ব্যবস্থা করে একটু পরেই খাবার নিয়ে হাজির হল। এত রাতে খিদের চেয়ে ক্লান্তিটাই অনেক বড় বলে মনে হল, তাই অল্পকিছু খাবার মুখে তুলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শুয়ে পড়লাম।

দুলকিচালে দিদনার পথে

ভোর হল পাহাড়ে ঘেরা ছোট্ট শহর লোহাজংয়ে। আগের রাতে শহরটাকে দেখার বা চেনার কোনও উপায় ছিল না। এদিন সকালে উঠে ব্যালকনি থেকে সামনের পাহাড়ের দিকে চেয়ে রইলাম সূর্য ওঠার অপেক্ষায়। কিন্তু এই শহরে ভোরের সূর্য থেকে যায় পাহাড়ের আড়ালেই। সামনে নন্দাঘুন্টি পাহাড়ের চূড়া ছাড়া আর বিশেষ কিছুই দেখার নেই। হালকা কুয়াশায় সেই পাহাড়ে ভোরের লাল আভাও সেভাবে চোখে পড়ল না। গোয়ালদাম থেকে এই শহরে গাড়িপথে যোগাযোগ রয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেও খুবই সীমিত। সকালের হালকা ব্রেকফাস্ট সেরে আমরা পিঠে ছোট ব্যাগ নিয়ে রওনা দিলাম দিদনার

পথে, শুরু হল প্রথম দিনের ট্রেকিং। তবে নয়দিনের এই ট্রেকে বড় রুকস্যাকগুলো আমাদের বইতে হবে না, তার জন্য ক্যাপ্টেন আগেই পোর্টারের ব্যবস্থা করে রেখেছে।

দিদনার পথের শুরুটা সহজ উতরাই, অনেকটা গ্রামের রাস্তার মত। অল্প কিছুটা এগোতেই দূরে পাহাড়ের গায়ে বিন্দুর মত দেখা গেল আজকের ঠিকানা দিদনা গ্রাম। শুরুতেই গ্রামটা দেখতে পাওয়া গেলেও পথ বেশ অনেকটাই। এই পথে দেব নিজে আমাদের গাইড হয়নি ঠিকই, তবে ওর ভাই আনন্দকে পাঠিয়েছে আমাদের দেখভালের জন্য। বছর একুশের আনন্দ যেমন ছটফটে, শারীরিক ভাবে তেমনি ফিট। অভিজ্ঞতা কম থাকায় হয়তো এই পথের ইতিহাস বা ছোটোখাটো গল্পগুলো সেভাবে গুছিয়ে বলতে পারে না, কিন্তু ট্রেকারদের ভালোমন্দের খেয়াল রাখার ব্যাপারে একটুও গাফিলতি নেই। রাস্তায় কিছু পর পর পাহাড়ি ঝরনা নেমে এসেছে আর তার ওপর দিয়ে বানানো হয়েছে পায়ে চলার মতো ঢালাই করা ব্রিজ। প্রথম প্রথম ঝরনাগুলো গুনতে গুনতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু কিছুক্ষণ পর হাল ছেড়ে দিলাম, এ যে অগুন্তি! আমাদের ধীর গতির সঙ্গে তাল মেলাতে আনন্দ কিছুদূর গিয়ে একটু করে জিরিয়ে নিচ্ছিল। সে হোক তা সত্ত্বেও আমরা বেশ ধীরেসুস্থে দুচোখ ভরে পাহাড়ি গ্রাম দেখতে দেখতে এগোতে লাগলাম। কোথাও জনমানুষহীন একটা কুঁড়ে ঘর, কোথাও বা আবার পাহাড়ের গায়ে রংবাহারি জংলি ফুল। কুঁড়েঘরের চাল টালির নয়, পাথরের পাতলা টুকরো পাশাপাশি সাজিয়ে ছাউনি দেওয়া। আর ঘরগুলো পাহাড়ের ধাপে যেন কোনোরকমে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে! প্রায় দেড় ঘন্টা চলার পর একটা ঘাসেঢাকা সমতল জমিতে পৌঁছলাম, আমাদের রাস্তায় প্রথম বুগিয়াল। মাহিলা টপ জাতীয় কিছু একটা নাম এর। ঘাসের মাঝখানে একটা পাথরের বেদি বানানো। সেটাকেই রাজসিংহাসন মনে করে তার ওপর চড়ে বসলাম।

মাহিলা টপের ডান আর বাঁদিকে কিছুটা উঁচু দুটো ঘাসে ঢাকা পাহাড়, আর সামনের দিকে অনেকটা খোলা জমি, একটা উপত্যকা বলা যায়। এখানে আরও কিছুক্ষণ থাকার ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই, দুপুরের মধ্যে পৌঁছতেই হবে দিদনা। কি আর করার আবার পাহাড়ি ঝরনা আর ব্রিজ পেরিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে হঠাৎই থমকে দাঁড়াতে হল। সামনে রাস্তার বেশ কিছুটা অংশ ধ্বসে পড়ায় পায়ে চলা পথটাই হারিয়ে গেছে। ডানপাশে ঢাল গিয়ে মিশেছে পাহাড়ি নদীতে, আর মাঝের অংশ কাদামাটিতে ভরা। আনন্দ একটা গাছের গুঁড়ি ফেলে কাদার ওপর কোনোরকমের একটা রাস্তা বানানোর চেষ্টা করল, আর আমাদের হাত ধরে সেই রাস্তা পার করে দিল। কাদারাস্তা পেরোতেই একটা রংবাহারি গ্রামের মধ্যে চলে এলাম। সবুজ পাহাড়ের ধাপে লাল রামদানার গাছ। আর রাস্তার দু'পাশ অসংখ্য জংলি ফুলে সাজানো। তবে সৌন্দর্যের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে বিছুটি গাছের চেয়েও ভয়ংকর একধরনের কাঁটাগাছ। পাহাড়ের সামান্য ধার ঘেঁসে হাঁটতে গিয়ে হাতে সেই কাঁটার একটু ছোঁয়া লাগতেই অসহ্য জ্বালা শুরু হল। তবে ক্যাপ্টেন এর এক দাওয়াই বলল বটে, তবে সেটা মেনে নিতে খুবই কষ্ট হচ্ছিল। নাকের শুকনো কফ দিয়ে নাকি আস্তে আস্তে সেই কাঁটাগুলো তুলে ফেলতে হবে, এটাই উপযুক্ত ওষুধ! ফুলস্লিভ টিশার্ট না পড়ার জন্য আফসোস করতে থাকলাম। কয়েক পা এগোতেই সামনে বেশ বড়সড় একটা ঝরনা দেখতে পেলাম। ঝরনার ঠাণ্ডা জল হাতে দিতে জ্বালা কিছুটা হলেও কমল, আর পরে একসময় মিলিয়েও গেল।

এই ঝরনাটা আগেরগুলোর চেয়ে বেশ কিছুটা বড়, বেশ কিছুটা জায়গা নিয়ে আর এর ওপর দিয়ে কোনও ব্রিজও নেই। তাই পাথরের ওপর সাবধানে পা ফেলে ঝরনাটা পেরোতে হবে। তবে সৌভাগ্য এই যে জলের গভীরতা খুব বেশি না হওয়ায় জুতো ভিজলেও পা ভিজবে না। এর মধ্যেই আরেকটা টিমের একদল ট্রেকার হইহই করে এসে উদয় হল। ওরা ওয়ান থেকে এই পথ ধরেছে, রূপকুণ্ড পর্যন্ত যাবে। ওদের এগিয়ে যেতে দিয়ে আমরা ঝরনার ধারে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে নিলাম। আবার চলা শুরু হল। একটা বড় লোহার ফুটব্রিজ পেরোতেই দেখতে পেলাম অসংখ্য ভেড়া আর গরু পাহাড়ের গায়ে নিশ্চিন্তে চড়ে বেড়াচ্ছে। রাস্তার ধারে গিরগিটিও রঙ পালটে লুকিয়ে পড়ার চেষ্টা করছে না! বানরের দল একটা ছাউনিঘরের ওপরে রীতিমতো দাপাদাপি করছে! সবই যেন প্রাকৃতিক নিয়মেই চলছে, মানুষের রাজত্ব এখানে এখনও কায়েম হয় নি। এরপরেই এল একটা লম্বা চড়াই, ওপরদিকে চড়তে চড়তে হাঁফ ধরার জোগাড়! বেশ কিছুটা ওপরে ওঠার পর একটা চায়ের দোকান পাওয়া গেল। চা-বিস্কুট খাওয়ার ফাঁকে একপাল খচ্চর আর ঘোড়াকে মালপত্র নিয়ে ওপরের দিকে উঠতে দেখলাম। চায়ের দোকানদার জানালো দিদনা আর বেশি দূরে নয়। আর কিছুটা হাঁটতেই দিদনা গ্রাম চোখে এল। ঘড়িতে তখন আড়াইটা।

দিদনা খুবই ছোট গ্রাম, এখানকার লোক মূলতঃ চাষবাস করে আর ট্রেকিং গাইড হিসেবে ট্রেকারদের সঙ্গে পাড়ি জমায় পাহাড়ি পথে। দেব-এর বন্ধু মহিপৎ-এর পরিচিত একজনের বাড়িতে আমাদের রাখা হল। পাহাড়ের ধাপে একটা দোতলা গ্রাম্য বাড়ি, বেশ সাদামাঠা। ওপর-নীচ মিলিয়ে খান চারেক ঘর। তার একটায় আমাদের থাকতে দেওয়া হল। পাশের ঘরে আবার অন্য ট্রেকিং টিম। বিভিন্ন ট্রেকিং গ্রুপের সৌজন্যে একসঙ্গে অনেক ট্রেকার হাজির হয়েছে এখানে। সবাই মিলে বেশ জমজমাট করে তুলেছে গ্রামটা। কোনো দলে চার-পাঁচজন আবার কোনো কোনো বড় দলে তো নাকি পঞ্চাশজনও রয়েছে! এরা বেশিরভাগই চলেছে রূপকুণ্ড পর্যন্ত।

দুপুরের খাবার খেয়ে বেড়িয়ে পড়লাম গ্রামের আশপাশটা ঘুরে দেখতে। গ্রামের একপাশে কিছুটা চাষের জমি আর অন্যপাশে সমতলে ট্রেকারদের ক্যাম্প করার জায়গা। মাঝখান দিয়ে রাস্তা চলে গেছে পাহাড়ের ওপর দিকে। দেখা হল এক বাঙালি ট্রেকিং গ্রুপ "উই দ্য বোহেমিয়ানস"-এর সঙ্গে। ক্যামেরাকে সঙ্গী করে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ানো সৌরভ-অভীকদের কাছে একরকম নেশার মতো। ট্রেকারদের জন্য বরাদ্দ সমতল জায়গায় ওরা টেন্ট ফেলেছে। এখান থেকে দূর পাহাড়ের অনেকটাই দেখা যায়।

একটু পরেই মহিপৎ এসে হাজির হল। ও অনেক পুরানো গাইড, মানবদাদের সঙ্গে আগেই পরিচয় ছিল। এবার একটা ট্রেকিং গ্রুপের গাইড হয়ে রূপকুণ্ড পর্যন্ত যাবে। চেনামুখ দেখতে পেয়ে অনেকক্ষণ ধরে গল্পগুজব চলল। আটটা বাজতে বাজতেই রাতের খাবার সময় হয়ে এল। লঘুপাক নৈশাহারের শেষপাতে কাস্টার্ডও মিলল। খুব জলদিই রাত নেমে এল দিদনায়।

বুগিয়ালের দেশে

পরদিন সকাল সকাল রুটি সবজি দিয়ে ব্রেকফাস্ট করে প্যাককরা টিফিন সঙ্গে নিয়ে বেড়িয়ে পড়লাম আরো ওপরের দিকে ওঠা পাহাড়ি পথ ধরে। মানবদা দাঁতের ব্যথা আর অ্যান্টিবায়োটিকের অ্যাকশানে কাবু, তার ওপর পেটের গণ্ডগোল। তাই আমরা দুজন খুব আস্তে আস্তে চড়াইপথে এগোতে থাকলাম। প্রথমে কিছুটা পথ খোলা আকাশের নীচ দিয়ে গেলেও কিছুক্ষণের মধ্যেই জঙ্গলের রাস্তা ধরতে হল। তবে এই রুটে আরও অনেক ট্রেকার চলায় পথ হারানোর কোনও সম্ভাবনাই নেই। অন্য ট্রেকারদের ফলো করে, কখনও পায়ে চলার চিহ্ন দেখে এগোতে লাগলাম। প্রায় সোয়া তিন ঘন্টার চেষ্টায় পাহাড়ের ওপর একটা খোলা জায়গায় এসে উঠলাম। জায়গাটার নাম তোলাপানি। একটা চায়ের দোকান থাকায় যেন ট্রেকারদের মেলা বসেছে। ঘন দুধ দিয়ে বানানো গরম চায়ে গলা ভিজিয়ে অনেকেই ঘাসের জমিতে চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়ছে। সে এক পরম শান্তি।

তোলাপানিতে চায়ের দোকানটা ছাড়া আর কোনও ঘরবাড়ি চোখে পড়ল না। পুরো জায়গাটা লম্বা লম্বা গাছপালায় ঘেরা। মাঝে কিছুটা ঘাসেঢাকা ফাঁকা জমি। কিন্তু বেশিক্ষণ সময় কাটাবার উপায় নেই, আকাশ মেঘ আর কুয়াশার চাদরে ঢেকে যাচ্ছে। আমার ক্যামেরার একটা ব্যাটারির চার্জ ফুরিয়ে যাওয়ায় মানবদা নিজের ক্যামেরাটাই দিয়ে দিল ছবি তোলার জন্য। অল্পক্ষণ তোলাপানিতে কাটিয়ে আবার এগিয়ে চললাম অন্যান্য ট্রেকিং দলকে ফলো করে। তবে এবারের রাস্তায় চড়াই অনেক কম, মোটামুটি পাহাড়ের শিরা বা রিজ (Ridge) ধরে এগিয়ে চলতে থাকলাম। চলার পথ সবসময় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল না, একটু পরপরই কুয়াশায় ঢেকে যেতে থাকল। আবার কখনও আন্দাজে পায়ে চলা পথ অনুসরণ করে এগিয়ে যেতে থাকলাম। প্রায় ঘন্টাদুয়েক এভাবে চলার পর সামনে দেখতে পেলাম অনেকটা ফাঁকা জমি, পুরোটাই ঘাসে ঢাকা। আরেকটু ভালো করে দেখে বুঝলাম এটা আসলে ঘাসেঢাকা পাহাড় - একেই বলে বুগিয়াল। কিন্তু এত বড় জায়গা জুড়ে এরকম গাছপালাহীন শুধু ঘাসেঢাকা পাহাড় থাকতে পারে আমার কল্পনায়ও কখনো আসে নি।

এই বুগিয়ালের নাম আলি বুগিয়াল। এখান থেকে ঘুরে যাওয়া পথিক নাকি বারবার ফিরে আসে কোন অজানা এক আকর্ষণে! আলি বুগিয়ালের সঙ্গে বেদনি বুগিয়াল মিশে একটানা ঘাসের পাহাড় তৈরি করেছে। মাইলের পর মাইল জুড়ে প্রকৃতির খেয়ালে তৈরি হওয়া এই আলি-বেদনি বুগিয়াল নাকি এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম বুগিয়াল। এত ওপরেও দেখা গেল গরুর পাল, দিব্য পাহাড়ের ওপর বসে জাবর কাটছে! না শুধু ঘাসই নয়, মানুষের খাওয়ার জন্য ম্যাগি আর চাও পাওয়া যাচ্ছিল একটা ছোট্ট ছাউনিতে। ক্যাপ্টেন সুখেনদা আর বাবুদা অনেক আগেই এখানে পৌঁছে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। মানবদা বেশ কিছুটা পিছিয়ে পড়েছিল। আমরা অপেক্ষা করার ফাঁকে বুগিয়ালের সৌন্দর্য আর মায়াবী রূপ দুচোখ ভরে দেখতে থাকলাম। আলি টপ অনেকটা বড় একটা সমতল ঘাসের জমি। দুপাশে দুটো ঢাল নেমে গেছে অতল খাদের দিকে। সামনে আরো উঁচু একটা ঘাসের পাহাড়, সেটাতেও কোনও বড় গাছের অস্তিত্ব নেই। অনেকক্ষণ ভেবেও বুঝে উঠতে পারলাম না যে কেন এই পাহাড়গুলো শুধুই ঘাসে ঢাকা আর কেনই বা এতে বড় গাছপালার অভাব! অথচ এই পাহাড়েরই সামান্য নীচে স্পষ্ট ট্রি লাইন দেখা যাচ্ছে! একটু পর মানবদা এসে পৌঁছলে প্যাক করা লাঞ্চটা খেয়ে আবার চাঙ্গা হয়ে নিলাম। তবে আজকের মতো পথ আর বেশি নেই।

এককাত হওয়া ঘাসেঢাকা মাঠের বুক চিরে চলা রাস্তা ধরে আবার এগিয়ে চললাম বেদনি বুগিয়ালের দিকে। আলি টপ থেকে পাহাড়ের ঢালের রাস্তাটা যেন অনেক অনেক লম্বা মনে হচ্ছিল। তবে যত এগোতে থাকলাম শেষ সীমানাটা আস্তে আস্তে কাছে এগিয়ে আসতে থাকল। কিছু পরে দুটো টিলার ফাঁক গলে বেড়িয়ে আসতেই সামনে দেখতে পেলাম এক অনন্য দৃশ্য। নীচের দিকে অনেকটা খোলা ঘাসে ঢাকা জমি আর তাতে সাজানো রয়েছে অসংখ্য রঙবেরঙের তাবু। এই তাহলে বেদনি বুগিয়াল? আকাশ কুয়াশায় ঢাকা থাকায় বিকেল চারটেতেই হাড়কাঁপানো শীতে ঠকঠক করে কাঁপতে থাকলাম। দূর থেকে ক্যাপ্টেন আর বাবুদা আমায় দেখতে পেয়ে হাত তুলে নিজেদের উপস্থিতি জানিয়ে দিল। রাস্তা ছেড়ে পাহাড়ের গায়ের শর্টকাট বেয়ে নীচের দিকে নেমে এলাম। আমাদের টেন্টটা একটু ওপরে, নীচে অন্যান্য ট্রেকিং টিমের ক্যাম্পগুলো সাজিয়ে গুছিয়ে বানানো হয়েছে। তবে পাহাড়ের ওপরে হওয়ায় এখান থেকেই প্রাকৃতিক দৃশ্য বেশি সুন্দর

দেখতে পাওয়া যায়।

বেদনি বুগিয়াল বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর ক্যাম্পসাইটগুলোর মধ্যে একটা। তিনদিক পাহাড়ে ঘেরা, শুধু একদিকে যেখানে কুয়াশাঢাকা রয়েছে সেদিকেই নাকি অনেকগুলো পাহাড়ের চূড়া দেখতে পাওয়া যায়! তবে বেশ বুঝতে পারলাম যে এই বিকেলে তাদের মুখ আর দেখা যাবে না। শুনতে পেলাম নীচে, যেখানে অন্যান্য ট্রেকিং গ্রুপগুলো টেন্ট ফেলেছে সেখানে নাকি মোবাইলে 'টাওয়ার' পাওয়া যাচ্ছে। অল্প কিছু মুখে গুঁজে মোবাইল হাতে নিয়ে সেই খবরের সত্যিমিথ্যা যাচাই করতে বেড়িয়ে পড়লাম। টেন্ট এরিয়ার একদম শেষে খাদের কিনারায় গিয়ে পা ঝুলিয়ে বসে অবশেষে মোবাইল নেটওয়ার্কের সন্ধান মিলল। খুব দুর্বল কানেকশন হলেও বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারলাম, সবকিছু ঠিকঠাক আছে জানিয়ে বাবা-মা কেও আশ্বস্ত করা গেল।
বেদনি বুগিয়ালে টেন্ট এরিয়ার কাছাকাছি পাহাড়ের গা ফুঁড়ে একটা জলের ধারা বেরিয়ে এসেছে। সেই জলেই সবার জন্যে রান্না-খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। মালপত্র আর ক্লান্ত ট্রেকারদের বওয়ার জন্য নিয়ে আসা খচ্চর আর ঘোড়ার চিৎকারে পুরো বুগিয়ালটাই বেশ সরগরম হয়ে উঠেছে। আমাদের টেন্টের কাছাকাছি পাথর দিয়ে বানানো দেয়ালের ওপর পলিথিনের ছাউনি দিয়ে একটা দোকানঘর বানানো হয়েছে, যদিও সেই দোকান বন্ধই দেখতে পেলাম। সন্ধ্যা নেমে আসার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়াও বাড়তে লাগল। কাঁপুনি থেকে বাঁচতে তাড়াতাড়ি টেন্টে ফিরে এলাম। একটা তাঁবু খাটিয়ে কিচেন টেন্ট ফেলা হয়েছে আর একটু দূরে টেন্ট টয়লেট বসানো হয়েছে। আমাদের চার জনের জন্য দুটো টেন্ট পাশাপাশি বসানো হয়েছে আর তার খুব কাছেই আরও একটি ছোট ট্রেকিং দল টেন্ট ফেলেছে।
সন্ধ্যার ঠিক আগে আকাশ সামান্য একটু পরিষ্কার হতে সামনে ত্রিশূল পর্বতের চূড়াকে দেখতে পাওয়া গেল। তিনটে চূড়ার মধ্যে একটা মেঘে ঢাকা থাকলেও বাকি দুটোর ওপর পড়ন্ত সূর্যের আলো পড়ে লাল আভা ছড়িয়ে দিল। পাহাড়ের আড়ালে হওয়ায় খুব তাড়াতাড়ি সন্ধ্যা নেমে এল বেদনি বুগিয়ালে, আর কখন যে রাতের খাবারের সময় হয়ে গেল টেরই পেলাম না! এই শীতে টেন্টের আশ্রয় ছেড়ে আর খেতে যাওয়ার ইচ্ছে করছিলো না, কিন্তু খালি পেটে শরীরের জোর আরো কমবে সেই ভয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসতেই হল। ছোট্ট তাঁবুর আশ্রয় থেকে বাইরে পা রাখতেই বেদনি বুগিয়ালের নতুন রূপ দেখতে পেলাম। আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাওয়ায় চাঁদের আলো পুরো বুগিয়াল জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। তবে বুগিয়াল নয়, নজর কেড়ে নিচ্ছে সামনের ত্রিশূল আর নন্দাঘুন্টির চূড়া। এমনিতে এই পাহাড়দুটোর চূড়া সব সময়ই দুধসাদা বরফে ঢাকা থাকে, চাঁদের আলোয় তারা যেন আরো উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিল। ওদের দেখতে দেখতেই কখন যেন গরম গরম ডালভাত আর সুজি আমাদের গলা দিয়ে নেমে গেল! সকাল সাতটায় দিদনা থেকে রওনা দিয়ে বিকেল চারটে অবধি হাঁটার ক্লান্তি মেটাতেই চেষ্টা করলাম তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে। কিন্তু বিধি বাম, ঘোড়াদের চিঁহি শব্দ আর গলার ঘন্টার আওয়াজে চোখে ঘুম থাকলেও তা বেশি গভীর হওয়ার আগেই ভেঙে যাচ্ছিল। শেষমেশ অনেক কষ্টে স্লিপিংব্যাগে কান ঢেকে আধঘুমে রাত কাটানো গেল।

ব্যাসদেবের পথ ধরে

ভোর হওয়ার আর তর সইছিল না, পাঁচটা বাজতে না বাজতেই সূর্যের প্রথম আলোকে ফটোবন্দি করার জন্যে ক্যামেরা নিয়ে বেড়িয়ে পড়লাম। সূর্যদেব আমাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে পাহাড়ের পেছনেই উদয় হলেও ভোরের আলোয় ত্রিশূল পাহাড়ের চূড়া লাল আভায় রাঙিয়ে উঠল। সম্ভবতঃ আগের রাতে দূর পাহাড়ে তুষারপাত হয়েছিল, এদিন ভোরে তাই আকাশ বিলকুল পরিষ্কার। কাল বেদনি বুগিয়ালের যে পাশটা ঘন মেঘে ঢাকা ছিল আজ সেদিকেই দেখা যাচ্ছে একের পর এক পাহাড়ের সারি। প্রথমে নীলকন্ঠ, তারপর একে একে বালাকুন, চৌখাম্বা, জাহ্নুকুট, সতোপন্থ আর ভাগীরথীর চূড়াও লাল হয়ে উঠল। এদের পেরিয়ে আরও দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল তবে সেখানের পাহাড়গুলোকে আর আলাদা করে বুঝে ওঠা সম্ভব হল না।
ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলল, আমাদের এক জায়গায় থাকার জো নেই। পান্তা দিয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে আবার পিঠে ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হল। সামনেই বেদনি কুণ্ড, এত সুন্দর লেক সচরাচর দেখা যায় না। সবুজ ঘাসের জমির মাঝে এক টুকরো কাঁচের মত স্বচ্ছ জলে ভরা এই সরোবর। সেই জলেই দেখা যায় সবুজ ঘাসের মাঝে নন্দাঘুন্টি আর ত্রিশূল পাহাড়ের প্রতিচ্ছবি। লেকটা প্রায় গোলাকার আর পাথর-সিমেন্টের পাকাপোক্ত দেয়াল দিয়ে ঘেরা। লেকের জল হাজার বৃষ্টিতেও নাকি উপচে পড়ে না! তবে লেকের থেকে কয়েকটি নালা বাইরে বেরিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে নীচে নেমে গেছে, হয়তো উপচে যাওয়া জল এই নালাগুলো দিয়েই বেরিয়ে যায়।

বেদনি কুণ্ডের পাশে পাথর-মাটি দিয়ে বানানো দুটো ছোটো ছোটো মন্দির। শুনলাম, পুরাণে নাকি আছে ব্যাসদেব এই কুণ্ড থেকেই জল নিয়ে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে গঙ্গোত্রীর পথে রওনা হয়েছিলেন আর বেচারা গণেশ সেই মন্ত্র লিখতে লিখতে তাকে অনুসরণ করেছিলেন।

বেদনি কুণ্ড থেকে এগিয়ে আমরা পাহাড়ের গায়ে লেগে থাকা সরু সুতোর মতো পথ ধরলাম। এখান থেকে নীচের দিকে তাকালে সবুজ ঘাসের মাঝে গোলাকৃতি কুণ্ডের সম্পূর্ণ চেহারাটা বুঝতে পারা যায়। সরু রাস্তা দিয়ে এগোতে এগোতে মাঝে মাঝে অনেক ঘোড়া আর মালবাহী খচ্চরকেও পাস করে দিতে হচ্ছিল। হঠাৎই দেখতে পেলাম এক সহিস ঘোড়ার পিঠ থেকে নিচে খাদের দিকে পড়ে অনেকটা গড়িয়ে গেল, তারপর কোনও এক অলীক ক্ষমতাবলে আবার চটজলদি উঠে এল রাস্তায়! পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় জিগ্যেস করলাম "সব কুছ ঠিক হ্যায় তো ভাইয়া?" উত্তর এল – "হাঁ হাঁ, সব ঠিক হ্যায়, ইয়ে তো চলতা হি রহতা হ্যায়!" আবার কিছু পড়ে দেখলাম একটা ছোট্ট টাট্টু ঘোড়া ছুটতে ছুটতে মনিবকে ফেলে পাহাড়ের ওপর দিকে উঠে গেল, আর মনিব তাকে কিছুতেই নামাতে পারে না! ও নাকি আমাদের ভয়ে আর নিচে নামছে না। অবশেষে আমরা পাহাড়ের আড়ালে লুকিয়ে পড়তে সেই ঘোড়াকে বাগ মানানো গেল! এদিনের রাস্তায় বেশি একটা বৈচিত্র্য নেই, একটাই সরু রাস্তা এগিয়ে চলেছে পাহাড়ের গা বেয়ে। সকাল নটায় রওনা দিয়ে প্রায় পৌনে দুচঘন্টা পর একটা চায়ের দোকান খুঁজে পেয়ে হাত পা ছড়িয়ে বসে পড়লাম। এই জায়গার নাম ঘোড়া লোটানা। এর পর নাকি ঘোড়ার খাবার পাওয়া যায় না, তাই এখান থেকে সমস্ত ঘোড়াকে ফিরিয়ে দেওয়া হত বেদনির দিকে। তবে এখনকার দিনে ঘোড়ার খাবার তার সঙ্গে সঙ্গেই নিয়ে যাওয়া হয়, তাই এর পরের রাস্তাতেও ঘোড়া চলার কোনও বিরাম নেই। এখানে দেখার মতো বেশি কিছুই নেই, মাঝে মাঝে এক একটা চিল কিংবা বাজপাখি অনেক ওপর দিয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে আর কিছু ছোটো ছোটো পাখি সুড়ুৎ করে উড়ে চলে যাচ্ছে, একটা উঁচু পাথরের ওপর বসে এই দেখা ছাড়া আর কোনও কাজ ছিল না। মানবদা দুর্বল শরীরে বেশ কিছুটা পিছিয়ে পড়েছিল, তাই প্রায় আধঘন্টা এখানে ওর জন্যে অপেক্ষা করলাম। আর তাছাড়া এদিনের চলার মতো আর বেশি পথ বাকি ছিলো না, সাত-তাড়াতাড়ি ক্যাম্পে গিয়ে করবোই বা কী? মানবদা এসে পৌঁছালে আমরা সেখান থেকে রওনা দিয়ে মাত্র পৌনে এক ঘন্টায় পাথরনাচুনি পৌঁছে গেলাম।

পাথরনাচুনিতে লাঞ্চ রেডিই ছিল। পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই খাবারের প্লেট হাতে পেয়ে গেলাম। এদিন রাস্তা কম হওয়ায় ক্লান্তির লেশমাত্র দেখা যাচ্ছিল না আমাদের চেহারায়। লাঞ্চের পর চারপাশটা একটু ঘুরে দেখতে লাগলাম। পাথরনাচুনির ক্যাম্পসাইটটা পায়ে চলা মূল পথের একটু পাশে, পাহাড়ের ঢালে। পাহাড়ের খাদটা খুব কাছে হওয়ায় সাইটটা খুবই ছোট, তাই খুব বেশি দল এখানে টেন্ট ফেলে না। আমরা ছাড়া আরও দু-একটি ছোট ছোট দলের ক্যাম্প বসেছে এখানে। তবে একদিনে অনেকটা পথ চলতে না চাইলে এখানে একটা রাত কাটিয়ে যাওয়াই ভালো। এখানকার গল্পকথায় জানতে পারলাম কোনো এক রাজা নর্তকিদের নিয়ে এখানে আসায় দেবতারা রুষ্ট হয়ে পাথর চাপা দিয়ে তাদের পাতালে পাঠিয়ে দেন। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের তর্কে না গেলে এই কাহিনিগুলোই চলার পথের প্রাপ্তি হয়ে বহুদিন মনের কোণে রয়ে যায়।

পাথরনাচুনিতে মূল রাস্তার ওপর সেনাবাহিনির একটা অস্থায়ী ক্যাম্প রয়েছে, রয়েছে কয়েকটা দোকানও। বিকেলে ঘুরতে

বেরিয়ে সেদিকে এগিয়ে গেলাম। দোকানে চা-ওমলেটও পেয়ে গেলাম। শুনতে পেলাম দোকানের পেছন দিক থেকে হিমালয়ের অনেকগুলো চূড়া দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু ঘন কুয়াশায় চারদিক ঢেকে থাকায় তার একটারও দেখা মিলল না। সন্ধ্যা নামার আগেই ক্যাম্পে ফিরে এলাম। পাথরনাচুনিকে ঠিক চোখ জুড়ানো ট্রেকিং স্পট বলা যায় না কোনওভাবেই, নেই কোনো নদী বা জঙ্গলের বৈচিত্র্যও, তবে এখানে একটা রাত না কাটানো হলে বেদনি থেকে আমাদের পরবর্তী ক্যাম্প ভাগুয়াবাসার দূরত্বটা একটু বেশিই হয়ে যেত। সন্ধ্যে সাতটাতেই রাতের খাবার রেডি হয়ে গেল, ভাত-রুটির সঙ্গে মাশরুমের তরকারি দিয়ে রাতের খাবার খেতে খেতে জ্যোৎস্নাভরা পরিবেশ ভালোভাবেই উপভোগ করা গেল। এরপর দূরে কোথাও একটা কুকুরের একটানা চিৎকার শুনতে শুনতে চোখে ঘুম এসে গেল।

~ ক্রমশঃ ~

~ রন্টি স্যাডেল ট্রেক রুটম্যাপ // রন্টি স্যাডেল ট্রেকের আরও ছবি ~

'আমাদের ছুটি' আন্তর্জাল ভ্রমণপত্রিকার সহসম্পাদক সুদীপ্ত দত্ত ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নিরালার খোঁজে। নতুন জায়গার সাথে মিশে আপন করে নেন সেখানকার জীবন, সংস্কৃতি আর খাদ্যাভ্যাস। তারপর তাঁর প্রিয় পত্রিকাটির পাঠকদের সাথে ভাগ করে নেন সেই যাত্রাপথের খুঁটিনাটি।

Comments

Name

Enter your comment here

Comment Add Image

Not using Html Comment Box yet?

No one has commented yet. Be the first!

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011-19 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

একা একা, ঘুরেঘারে, হীরাবন্দরে

তপন পাল

-১-

যার কেউ নেই তার কে আছে? উত্তরটা সম্ভবত উপরওয়ালা, কিন্তু আমি আবার ওই পথের পথিক নই, তদুপরি তিনি যে আছেন এমনতর কোন প্রমাণ যখন অদ্যাবধি আমার হাতে নেই, তখন নিঃসংশয়ে বলি কি করে যে তিনি আছেন! তবে প্রশ্নকর্তা যদি ভ্রমণার্থী হন, তাহলে নিঃসংশয়ে নিঃসংকোচে বলতে পারি যে যার কেউ নেই তার ডায়মন্ডহারবার আছে। পয়সা নেই তো কী হয়েছে, সময় নেই তো কী হয়েছে, শারীরিক সামর্থ্য নেই তো কী হয়েছে, ডায়মন্ডহারবারের দরজা সবার জন্যে খোলা। গিয়ে গঙ্গার ধারে বসো, ভেবে নাও এটাই হরিদ্বার কি বারাণসী, গঙ্গা তো সেই একই, চা ঘুগনি খাও; সূর্য পাটে গেলে ঘরের ছেলে ঘরে যাও। মিটে গেলো। আমার যখন অনেকদিন বেরোনো হয়না, ঘরে বসে প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে, তখন রবিবার দুপুরে খেয়ে উঠে ডায়মন্ডহারবার; আমার সমুদ্রবিলাসী মন জল দেখলে ভারি খুশি হয়। তারপর রাতে খাওয়ার সময় হওয়ার আগেই বাড়িতে।

এই বর্ষায় সারাদিনের জন্যে ডায়মন্ডহারবার! কেমন হবে? তবে আমার আবার সিধে যাওয়ার চেয়ে ঘুরে যেতে ভাল লাগে। দিল্লি থেকে ফেরার সময় উড়োজাহাজ যদি পানিহাটির হুগলি পেরিয়ে, বি টি রোড আর রেললাইন পেরিয়ে, কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে পেরিয়ে, ফের রেললাইন পেরিয়ে ঝুপ করে নেমে পড়ে, আমার ভারি কষ্ট হয়। তার চেয়ে এই দেখলাম কলকাতা, তারপরে বোঁ করে উড়ে গাঢ় অন্ধকারে, নিচে শোনা যাচ্ছে সুন্দরবনের বাঘের গর্জন, এরকমভাবে মিনিট পনেরো ওড়াউড়ির পরে ফের কলকাতা – এমনটি আমার ভারি পছন্দের।

-২-

তাই দিন শুরু হল ভোরবেলায়। প্রথম গন্তব্য মহেশতলায়, নঙ্গী রেলষ্টেশনের অনধিক দুই কিলোমিটার পূর্বে বরকনতলায় বড়াখান গাজিসাহেবের মাজার; মতান্তরে তিনি কুমিরের রক্ষাকর্তা, বনবিবি আর দক্ষিণ রায়ের মধ্যে সন্ধিপ্রণেতা। মস্ত এক মাঠ, ঢুকতে বাঁয়ে কবরখানা বাঁশঝাড়ে ঢাকা, তার পরেই শানবাঁধানো ঈদগাহ, নমাজ পড়ার জায়গা। একটু যে খটকা লাগল না তা নয়, কারণ যতদূর জানা আছে কবরে নমাজ পড়া নিষিদ্ধ। ডাইনে ফাঁকা মাঠ। কিছুটা এগিয়ে মস্ত এক শিরিষ গাছ (woman's tongue tree. Albizia lebbeck), মোটা মোটা ডালগুলি কেটে গাছটিকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে, সম্ভবত ছত্রাক সংক্রমণের জন্য। যেটুকু ডাল আছে তা পরজীবী উদ্ভিদে পূর্ণ; গোড়ায় বাবার মাজার, দূরে পুকুর আর পাশে এক বকুল গাছ (Spanish cherry/Mimusops elengi)।

সেখান থেকে বজবজ ট্রাঙ্ক রোডে উঠে আবার ডাইনে, রেললাইন পেরিয়ে বাবা বুড়োশিবের থানে। লোকবিশ্বাসে ইনি নাকি তারকেশ্বরের তারকনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, তাই তারকনাথ কারো কথা না শুনলে এনার কাছে নালিশ জানাতে হয়। ইনি নাকি দুধ খেতে ভালোবাসেন, তাই সন্নিহিত অঞ্চলে একদা রেওয়াজ ছিল গাই বিয়োলে প্রথম কুড়ি দিনের দুধ ফেলে দিয়ে একুশতম দিনের দুধ বাবা বুড়োশিবকে দেওয়া। এখন গেরস্থবাড়িতে কেউ আর গোরু রাখে না, বাবার তাই সুখের দিন গিয়েছে। শুধু পালাপার্বণে মা জননীরা মাদার ডেয়ারির প্যাকেট কেটে বাবার মাথায় ঢালেন। গম্বুজধাঁচের মন্দিরটি অধুনানির্মিত, পিছনে বাবার পুকুর, কিন্তু থানটি ও সন্নিকটস্থ লোকালয় অতি প্রাচীন। স্বাধীনতার পর থেকে ভারতে অনেক রেল লেভেলক্রশিং বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু নতুন করে লেভেলক্রশিং চালু হয়েছে খুবই কম, আমার জ্ঞানের মধ্যে মাত্র একটি, নিউ আলিপুরের বেইলি ব্রিজ; তাও সে এক ব্যতিক্রমী প্রেক্ষাপটে। এই মন্দিরে আসার জন্য একটি লেভেলক্রশিং আছে এবং এই শাখায় রেল চালু হয়েছে ১৮৯০ সালে (বৈদ্যুতিকরণ ১৯৬৫–৬৬ সালে ২৫ কেভি এসি ওভারহেড সিস্টেমে); তাই অনুমান করা যেতে পারে যে লেভেলক্রশিংটি সেই সময় থেকেই আছে। নিকটবর্তী জনবসতি না থাকলে সাহেবরা শুধু শুধু তো আর লেভেলক্রশিং বানাত না!

সেখান থেকে এঁকাবেঁকা রাস্তা ধরে অনেকখানি গিয়ে নঙ্গী শ্মশানকালী মন্দির। উৎকীর্ণ ফলক থেকে জানা গেল বছর কুড়ি আগে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের আগ্রহাতিশয্যে চাঁদা তুলে জমি কিনে মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে এবং মাতা শ্মশানকালী তথায় স্থানান্তরিতা হয়েছেন। তাঁর পুরাতন মন্দিরটি ঘাটের ওপরেই। চালের গোডাউন, কলকাতা বন্দরের পরিত্যক্ত লাইটহাউস, অনেকগুলি ছোটবড় মন্দির, তার মধ্যে মকরবাহিনী জাহ্নবীর ও হনুমানের মন্দিরদুটি নবনির্মিত; শ্মশান, একটু দূরে বাজার... একটু খুঁটিয়ে দেখলে জায়গাটির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়। কেওড়াতলা শ্মশানের প্রতিষ্ঠা ১৮৬২তে, তার আগে মৃতদেহ দাহ করার কোন নির্দিষ্ট জায়গা খোদ কলকাতা শহরেই ছিল না, লোক যেখানে ফাঁকা জায়গা পেত সেখানেই কাঠকুটো দিয়ে জ্বেলে দিত। এই শ্মশানের প্রতিষ্ঠা তার নিকটবর্তী সময়ে বলেই ধারণা, কারণ নঙ্গী বাজারে দেখলাম একটি ব্যানার ঝুলছে, চকচান্দুল গ্রামের জগদ্ধাত্রী পূজার এইবার একশ সাতষট্টিতম বর্ষ। অঞ্চলের জনবসতি তাহলে আরও প্রাচীন; আর জনবসতি থাকলে শ্মশান থাকবে, আর শ্মশান থাকলে কালী থাকবে না তা হয় নাকি!

পাশে ফেরিঘাট, যুগপৎ সারেঙ্গা ও হিরাপুরের খেয়া ছাড়ছে। তার পাশেই গগনচুম্বী ইমারত, এক আবাসন প্রকল্পের। আজ থেকে পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে অবধি, যখন পণ্য পরিবহনের প্রধানতম মাধ্যম ছিল নদীপথ, জায়গাটির গুরুত্ব ছিল। তারপর সড়ক যোগাযোগ উন্নত হয়েছে, নিকটবর্তী বাটা জুতোর কারখানারও আর সেই রমরমা নেই; স্বাভাবিক ভাবেই

জনপদের অর্থনৈতিক ভরকেন্দ্র সরে গেছে, জায়গাটি গুরুত্ব হারিয়েছে। একটু দূরে বাটা জুতোর কারখানার ঠিক বিপরীতে ১৯৬৫তে ডুবে গিয়েছিল রত্নাশোভনা জাহাজ, সম্ভবত ডুগং-এর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে। তার অপরপারে মানিকপুর, মানিকপিরের থান। গঙ্গার বান সেখানে গিয়ে বাধ্য ছেলের মত মাথা নামিয়ে নেয়, মানিকপির আছেন না!

মুশকিল আসান করো দয়াল মানিকপির। মানিকপির গবাদি পশুরক্ষার দেবতা, সেদিক দিয়ে তিনি বনবিবির ভ্রাতা শাহ জঙ্গলির দোসর। চেহারাটিও ওইরকমই – পরনে নীল লুঙি, চেককাটা ফতুয়া, মাথায় বাবরি চুল, তার ওপর তাজ পাগড়ি। অথবা কালো রঙের আলখাল্লা ও টুপি। তাঁকে নিয়ে মিথের অন্ত নেই। মাঝিদের কাছে তিনি বিশেষ মান্য দেবতা; নৌকা ভাসানোর সময়ে স্মর্তব্য। যেখানে তাঁর মূর্তি নেই, সেখানে প্রতীকি সমাধি বা ছোটো স্তূপেই তাঁর আবাস। সুফিদের স্বীকৃত পির এই লোকদেবতাটি দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীতে জরাথ্রুষ্ট ও খ্রিস্টধর্মের সংমিশ্রণে এক নতুন ধর্ম প্রচার করেন। মানিক শব্দটি 'মানিকী' (manichee, গ্রীক manikhaios) থেকে এসেছে। তাঁকে যিশুর সমগোত্রের ভাবা হয়। 'মানিকের নামে তোমরা হেলা করো না। মানিকের নাম রাখলে বিপদ হবে না'।

-৩-

নদীপার্শ্ববর্তী রাস্তা ধরে, অনেক ইটভাটা আর বনস্পতি দেখতে দেখতে, চকচান্দুল আর হেঁতালখালি গ্রাম। হঠাৎ একটা ভারি বেয়াড়া কথা মনে পড়ল। হুগলী নদী ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তিমূল, এই নদীপথ ধরেই তাদের যাওয়া আসা স্রোতে ভাসা। তবে হুগলী নদীর খামখেয়ালি চরিত্র সাহেবদের, শুধু ব্রিটিশদের নয়, সঙ্গে ফরাসি পোর্তুগিজ দিনেমারদের ভারি ভোগাচ্ছিল। প্রতি বছরেই বর্ষায় নদী গতিপথ বদলায়, খাত বদলায়; বর্ষার শেষে যেখানে সেখানে জেগে ওঠে চর, জাহাজ চালানোই এক ঝকমারি, সপ্তদশ দশক থেকেই চেষ্টা চলছিল হুগলী নদীর navigational ও topographical মানচিত্র তৈরি করার - কোম্পানি বাহাদুরের আমলে তা অপরিহার্য হয়ে উঠল। রেনেল সাহেব (Major James Rennell, 3 December 1742 – 29 March 1830, সমুদ্রবিদ্যাচর্চার জনক) Memoir of a map of Hindoostan প্রকাশ করলেন ১৭৮৮ তে। ড্যালরিম্পল সাহেব (Alexander Dalrymple 24 July 1737 – 19 June 1808। কোম্পানি বাহাদুরের হাইড্রোগ্রাফার) ভারতের প্রধান প্রধান নদনদী ও সৈকতরেখার মানচিত্র প্রকাশ করলেন – কিন্তু হুগলী নদী কর্তৃপক্ষের কাছে নিঃসপত্ন মনযোগ দাবি করছিল। এই নদীই সুবা বাংলার যোগাযোগের প্রধান, এবং বর্ষায় একমাত্র মাধ্যম। এইসব সাতপাঁচ ভেবে ১৮৩০এ একটি পদ সৃষ্টি করা হল, Hooghly Surveyor। নবসৃষ্ট পদে যোগ দিয়ে লয়েড সাহেব (Captain Richard Lloyd, ১৭৯৮ – ১৮৭৭) প্রকাশ করলেন BAY OF BENGAL, APPROACHES TO THE HOOGHLY RIVER: A Survey of the Sands and Channels forming the Entrance into The River Hoogly। এতদিন লোকে অভিজ্ঞতায় যা জানত, লয়েড সাহেবের লেখা তাকেই মান্যতা দিল; জানাল যে নাবিকদের কাছে হুগলী নদী পৃথিবীর অন্যতম আগ্রহ-উদ্দীপক ও বিপজ্জনক নদী। বিশেষত রূপনারায়ণ যেখানে হুগলীতে মিশেছে, আজকের সেই গাদিয়াড়ার কাছে তিন মাইল দীর্ঘ ও আধ মাইল প্রস্থের নদীখাতের বালুচর ও মগ্নচড়া – যার পোশাকি নাম James and Mary Sands (22° 14' N. and 88° 5' E) । THE IMPERIAL GAZETTEER OF INDIA, 1908, (OXFORD, AT THE CLARENDON PRESS) জানাচ্ছে যে ১৬৯৪ সালে ডুবে যাওয়া Royal James and Mary জাহাজের নামেই এই মগ্নচড়ার নামকরণ। মগ্নচড়াটি নদীখাতের মাঝবরাবর, তার দুইদিক দিয়ে জলধারা প্রবাহিতা। ১৮৬৫তে, এবং আবার ১৮৯৫তে, বিশেষজ্ঞরা নদীখাতের পশ্চিম জলধারা বরাবর দেওয়াল তুলে দেওয়ার কথা বলেন, কিন্তু বন্দর কর্তৃপক্ষ তা মানেননি।

বস্তুত, হুগলী নদীর মন্দভাগ্যের শুরু অষ্টাদশ শতকের শেষ বরাবর, দামোদর যখন তার গতিপথ পরিবর্তন করে। আগে দামোদর হুগলীতে মিশত এখনকার চাকদহ – শিমুরালির কাছে। ভূতাত্ত্বিক কারণে (কাঠমান্ডু উপত্যকার ভূকম্প ১৬৬৮?) অষ্টাদশ শতকে দামোদর এখনকার মশাগ্রাম-চাঁচাই-এর কাছে প্রায় সমকোণে তীব্র বাঁক নিয়ে দক্ষিণগামিনী হয়ে জামালপুর উদয়নারায়ণপুর হয়ে বালিচাতুরি আইমা হয়ে ফলতার কাছে হুগলীতে পড়ে। গতিপথ প্রলম্বিত হওয়ার কারনে দামোদর স্রোত হারায়, জায়গায় জায়গায় শুকিয়ে যায়; আর রূপনারায়ণ ও দামোদরের এই প্রায় যৌথ সম্মিলনে হুগলীতে আরও বেশি পলি জমে, কারণ দামোদরের জল কমায় সামগ্রিকভাবে হুগলী নদীর জলের প্রবাহ কমে, সে পলিকে আর সমুদ্রে ঠেলে দিতে পারে না; পলি জমতে থাকে, পরিণামে James and Mary Sands আরও বিপদজনক হয়ে ওঠে। ১৮৬৫তে Superintendent Engineer for the Department of Public Works in Bengal, Hugh Leonard মেটিয়াবুরুজের কাছে আকরা থেকে মোহনা অবধি হুগলী নদীর পূর্বপাড় বরাবর পাঁচিল তোলেন – উদ্দেশ্য হুগলীতে জলপ্রবাহ বাড়ানো। ভুমির স্বাভাবিক ঢাল পূর্বে হওয়ায় হুগলী নদী থেকে প্রচুর জল ছোট ছোট জলধারাবাহিত হয়ে এখন আমরা যাকে East Calcutta Wetlands বলি, সেখানে গিয়ে পড়ছিল। ভাবতে রোমাঞ্চ হল যে আমি এখন সেই ঐতিহাসিক পাঁচিল বরাবর চলেছি।

রাস্তায় এক জায়গায় চা খেতে থেমেছিলাম, দোকানদার কৌতূহলী হয়ে অনেক প্রশ্ন করলেন। তারপর আমি পাল শুনে জানালেন এই যে দেখছেন পাশাপাশি বট অশ্বত্থ – একশো বছর এখানকার পালবাড়ির গিন্নিমা এদের বিয়ে দিয়েছিলেন। ওনাদের তো গঙ্গায় নিজস্ব ঘাট ছিল; সেখানে নেয়ে ফেরার পথে গিন্নিমা ওই গাছের গোড়ায় গঙ্গা জল ঢালতেন। আপনি ওনাদের কেউ হন নাকি?

পথ পেরিয়ে, চটকলের মধ্য দিয়ে, বজবজ কালীবাড়ি। ঐতিহাসিক ও দৃষ্টিনন্দন। হুগলী নদীর পূর্বপারে অনেকখানি জায়গা নিয়ে মন্দির, শ্মশান ও ফেরিঘাট। ঘাটটি হাওড়া জিলা পরিষদের। লঞ্চ চালান হুগলী নদী জলপথ পরিবহন। হুগলিতে অনেক জাহাজ, পরপারে বাউড়িয়া। মন্দির প্রাঙ্গণটি বিস্তৃত ও নানাবিধমন্দিরসঙ্কুল হলেও দেবীমূর্তিটি ছোট, তাই লোকমুখে খুকি কালী। আর কালী এখানে খুকি বলেই অম্বুবাচীতেও পূজার্চনা বন্ধ হয় না।

বজবজ অতি প্রাচীন জনপদ, এবং বজবজ পৌরসভা অবিভক্ত বাংলার প্রাচীনতম পৌরসভাগুলির অন্যতম। বজবজের এক বাসিন্দা রেলগাড়িতে আমার প্রাত্যহিক সহযাত্রী ছিলেন। তিনি বলতেন বজবজ মানে খুকি মা, বজবজ মানে কোমাগাতামারু, বজবজ মানে ধনিয়ার ডালপুরি। খুকি মা দেখা হল, এবার গন্তব্য কোমাগাতামারু।

১৯১৩য় ক্যালিফোর্নিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'গদর পার্টি'; উদ্দেশ্য ছিল আমেরিকার প্রবাসী ভারতীয়দের দেশের মুক্তি সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করা। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ২৯ শে সেপ্টেম্বর বাবা গুরদিৎ সিং নামে এক পাঞ্জাবি তিনশ বাহাত্তর জন ভাগ্যান্বেষী শিখ যুবককে নিয়ে যাত্রীবোঝাই জাপানি জাহাজ 'কোমাগাতামারু' করে কানাডার ভ্যাঙ্কুভার বন্দরে পৌঁছায়। ব্রিটিশের গোপন নির্দেশে কানাডা সরকার বাবা গুরদিৎ সিংকে আশ্রয় না দিলে জাহাজটি কলকাতায় ফিরে আসে। জাহাজের যুবকরা বজবজে অবতরণ করলে শিখযাত্রীদের নানা ভাবে হেনস্তা করা হয়। ব্রিটিশ সেনার সঙ্গে সংঘর্ষে কুড়িজন শিখ ও ছজন পুলিশ নিহত হন। তার স্মারক হয়েছে, রক্ষণাবেক্ষণ অত্যুত্তম। শিখদের কাছে এটি ধর্মীয় স্থানের মর্যাদা পেয়েছে; জুতো খুলে ঢুকতে হয়, ধূপ মোমবাতি জ্বলছে। বজবজ রেলস্টেশনও আজ নাম বদলে কোমাগাতামারু বজবজ।
স্মারকস্তম্ভটির পাশেই পুরানো ও অধুনা পরিত্যক্ত বজবজ রেলস্টেশন। পরিত্যক্ত রেলস্টেশনটি দেখে বুকের মধ্য থেকে এক পুকুর আবেগ উঠে এল যেন। কাঠামোটুকু আছে, রেললাইনও আছে, তবে এখন এ লাইন দিয়ে রেকের সামনে ও পিছনে দুটি ডিজেল শানটার লোকো লাগিয়ে শুধু পুজালি তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের কয়লাবাহী রেলগাড়ি যায়; কারণ প্রকল্পে গাড়ি ঘোরাবার ব্যবস্থা নেই। সিংগল লাইন, অবৈদ্যুতায়িত; তবে এই জায়গাটি ইয়ার্ডসদৃশ। স্টেশন হওয়ার সুবাদে অনেকগুলি রেললাইন ছিল, সেগুলিই এখন শান্টিং লাইনের কাজ করছে।

এই স্টেশনটি নদীর ধারে; পরপারে বাউড়িয়া থেকে একটি শাখা লাইন এসেছিল নদীর ধারে ফোর্ট গ্লস্তারে, Fort Gloster Electric Limited এর কারখানার সুত্রে জায়গাটিরও ওই নাম। সাহেবদের স্বপ্ন ছিল এখানে একটি রেলসেতু করার; তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ১৯৪৭... আর হয়ে ওঠেনি। ১৯৬৯ সালের আগস্টে রেলওয়ে বোর্ডের এক সভায় বাষ্পীয় লোকোশেডগুলি বন্ধ করে দেওয়ার যথার্থতা তথা কাম্যতা নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা হয়। তৎসংশ্লিষ্ট নথিতে দেখা যাচ্ছে বাউড়িয়া লোকোশেডের এইচ এস ক্লাস লোকো বাউড়িয়া থেকে ফোর্ট গ্লস্তারে দৈনিক পনেরোটি ওয়াগন শান্টিং করছে। ২০১৭ – ২০১৮ আর্থিক বছরের বাজেটে শুশুকের মত ঘাই মেরে হঠাৎ সে ভেসে উঠল, দেখা গেল পশ্চিমবঙ্গে ডবল লাইন

পাতার জন্য ৯১ কোটি টাকা বরাদ্দ, তার মধ্যে আছে বজবজ-পুজালি ও পুজালি-উলুবেড়িয়া। তারপর আবার সব চুপচাপ। এ তো আর গঙ্গার শুশুক (Platanista gangetica gangetica) নয় যে ক্ষণকাল পরেই ভেসে উঠবে, সে ছিল মোহনার শুশুক (Orcaella brevirostris); একবার ডুব দিলে আর ভেসে ওঠার নাম নেই!

স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো থেকে ফেরার পথে ১৮৯৭-এর ১৯শে ফেব্রুয়ারি এখানেই জাহাজ থেকে নেমেছিলেন। ১৮ই ফেব্রুয়ারি এস এস মোম্বাসা জাহাজটি কলকাতার খিদিরপুর ডকে যাওয়ার পথে আকস্মিক কারণে বজবজে থেমে যায়। সারা রাত জাহাজে কাটিয়ে পরদিন সকালে এই স্টেশন থেকে শিয়ালদহগামী বজবজ লোকাল ধরে শ্যালদা হয়ে নরেন আলমবাজার মঠে। সেই স্মৃতিতে একটি স্মৃতিফলক আছে।

স্টেশনটিতে একটিই প্ল্যাটফর্ম; প্ল্যাটফর্মসন্নিহিত লাইন পার হয়ে আরও অনেকগুলি লাইন। এখনকার বজবজ স্টেশনের বিন্যাস এইরকমই। প্ল্যাটফর্মটি হ্রস্ব; সেটিই স্বাভাবিক কারণ এখন বারো কামরার গাড়ি চললেও ২০০২ অবধি এই লাইনে গাড়ি ছিল আট কামরার, তখন হয়তো আরও ছোট গাড়ি চলত। স্টেশনটি ঠিক কবে পরিত্যক্ত হয়েছিল জানি না, তবে অনুমান করি বিগত শতকের ত্রিশের দশকে; কারণ এখনকার বজবজ স্টেশনের সম্প্রতিলুপ্ত রুট কেবিনটির দেওয়ালে লেখা ছিল 1932।

বাকি রইল ধনিয়ার ডালপুরি। আজ থেকে বছর পঞ্চাশ আগে, চটকলের সেই রমরমার যুগে, ধনিয়া নামের এক হিন্দুস্তানি যুবক বজবজ প্লাস্টার (আসলে Pilaster) মোড়ে ডালপুরি বিক্রি করতেন। 'কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধন মান' ধনিয়াও ভেসে গেছে, রয়ে গেছে 'তব অন্তরবেদনা, ধনিয়ার ডালপুরি; চিরন্তন হয়ে'। আজও বজবজে রোল চাও বিরিয়ানি সদৃশ ত্বরিৎ-আহার্যকে টেক্কা দিচ্ছে কোমল ধবল বর্তুলাকার ডালপুরি, সঙ্গে খোসাসুদ্ধ আলুর মাখোমাখো তরকারি, দোকানবিশেষে আম বা তেঁতুলের চাটনি। মহালয়া হোক বা না হোক, এই আনন্দযজ্ঞে সবার মধুর আমন্ত্রণ।।

বজবজের পরে পুজালি। সেখানকার তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প পেরিয়ে ছোটবটতলার গা দিয়ে ডানহাতে বেঁকে রাস্তা, ডাইনে তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের পাঁচিল, বাঁয়ে বাঁশঝাড়, ঝোপঝাড়, পুকুর, জলাভূমি, বড় বড় গাছ, দিনের বেলাতেও আলো-আঁধারি। কিছুটা গিয়ে গঙ্গার পাড়ে অনেকখানি জায়গা নিয়ে ইন্দিরা উদ্যান; গাছগাছালি, রঙ্গিন মাছ, সে এক জমজমাট ব্যাপার। সামনেই গঙ্গা, আর সেখানে কুড়ি-পঁচিশটা ছোট জাহাজ প্রতীক্ষারতা, বাংলাদেশ থেকে তারা এসেছে তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের মিহি ছাই নিয়ে যেতে। ভারি চমৎকার দৃশ্য।

কাছেই অতীতের চিনা উপনিবেশ আচিপুর, ১৭৭৮ সালে এখানেই নোঙর করেছিল মি: টং আছুর বাণিজ্যতরী। লোককথা আজও বলে কিভাবে তিনি স্থানীয় জমিদারমশাইয়ের বিরাগভাজন হয়েছিলেন, আর কিভাবে চা খাইয়ে তিনি তাঁর ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের মন জয় করেছিলেন। আছু সাহেবকে চিনিকল তৈরির জন্য গঙ্গার ধারে বার্ষিক পঁয়তাল্লিশ টাকায় ৬৫০ একর জমি দেয়া হল। সাহেবও দেশে ফিরে চিনি তৈরির যন্ত্রপাতি ও লোকলস্কর নিয়ে এলেন। গঙ্গার ধারে চিনিকল চালু হল। তার আগে বাঙালি চিনি কাকে বলে জানতো না; গুড় খেয়েই সন্তুষ্ট ছিল। চিনা লোকের সংস্পর্শেই চিনির নাম চিনি, শক্কর (সংস্কৃত শর্করা) নয়; ঠিক যেমনি মিছরির (পুরাতন বাংলা মিশ্রি) মধ্যে মিশে থাকে ইজিপ্ট (মিশর; ইজিপ্টের আরবি নাম), বাতাবি লেবুর মধ্যে বাতাভিয়া; বা বন্দুকের মধ্যে ভেনিস (Banadique; ভেনিসের বাইজেনটাইন নাম)। আছু সাহেবের আর এক অবদান টানা রিকশার প্রচলন।

সেই সময় এই জায়গায় বাদাবন, ম্যানগ্রোভ, আর বাঘের উপদ্রব; সাহেব তাই দক্ষিণরায়ের মন্দির স্থাপন করেন। ভেতরে কোনো মূর্তি নেই, ঘটেই পুজো। পরবর্তীকালে সাহেব দক্ষিণরায়ের মন্দিরের সামনে চৈনিক দেবদেবী 'পাকুমপাহ' (খোদাখুদি)-র মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

লোককথা বলে, আগে এই দেবদেবীর মূর্তি সোনার ছিল। স্বপ্নাদেশ পেয়ে সাহেব সোনার মূর্তি গঙ্গায় ছুঁড়ে ফেলে এই চন্দনকাঠের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সোনার মূর্তি আজও নাকি শুয়ে আছে গঙ্গার অতলে; কত লোক আজও গঙ্গায় ডুব দিয়ে তাকে খোঁজে। মন্দিরের গর্ভগৃহ ছোটো, যত্নে সাজানো; মূল মন্দিরের সামনে প্রার্থনাকক্ষ। সেখানে লম্বা একটি টেবিলে সারি সারি মোমবাতি ও ধুপকাঠি জ্বালানোর ব্যবস্থা, মন্দিরের ডানদিকে বিশ্রামকক্ষ। সেখানে একপাশের দেওয়ালে মন্দির সংস্কারে সাহায্যদাতাদের নাম চিনা হরফে শ্বেতপাথরে লেখা। মন্দিরের বাঁকোণে কনফুসিয়াসের মন্দিরকক্ষ। কক্ষের সামনে ইতিহাস হাজির, আছু সাহেবের বাণিজ্যতরীর ভাঙা অংশ। পুরো মন্দিরচত্বর পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। মূল দরজাটি বেশ সুন্দর। সামনে বড়ো মাঠের মতো ফাঁকা জায়গা। মাঠের পাঁচিলের ওপাশে ছিল সাহেবের চিনির কল, আজ সেই জায়গায় গড়ে উঠেছে ঘনবসতি। আর মন্দিরের পেছনে যে পুকুরপাড়, সেখানেই ছিল আছু সাহেবের নীলচাষের খেত। পুরো মন্দিরচত্বর গাছগাছালিতে ছাওয়া, মধ্যমণি এক অতিকায় অশ্বত্থ, চেহারা দেখে মনে হয় আছু সাহেবের স্বহস্তরোপিত। সুন্দর পরিবেশ।

মন্দিরের মূল গেট দিয়ে বেরিয়ে ডানহাতে কিছুটা পথ গিয়ে গঙ্গা, অপর পাড়ে উলুবেড়িয়া। পাড় ধরে ডাইনে গঙ্গার তীরে নির্জনে শুয়ে আছেন টঙ অছু; বাঁধানো লাল সমাধিবেদি। জোয়ারের ছলাৎ ছলাৎ, জাহাজের ভোঁ - আজও হয়তো তাঁর জন্মভূমির কথা মনে পড়ে।

আছুর নামে জায়গাটির নামও হয় আচিপুর; চিনাদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। আছু সাহেবের মৃত্যুর পর চিনিকল বন্ধ হয়ে যায়; বাধ্য হয়ে চিনারা কলকাতায় ছড়িয়ে পড়েন। এখন আচিপুরে আর কোনো চিনা নেই। ফেব্রুয়ারি মাসের ১২-২৪ চিনা নববর্ষ উপলক্ষে এখানে উৎসব হয়। সেইসময় দেশের নানা প্রান্ত, এমনকি বিদেশ থেকেও চিনারা এখানে আসেন।

সমাধি থেকে দক্ষিণমুখী বিড়লাপুর যাওয়ার রাস্তায় গঙ্গার পাড় বরাবর উঁচু বাঁধ ধরে মিনিট পনের হাঁটলে বাঁহাতে নবাবি আমলে নির্মিত বারুদকল, ডাইনে অতি প্রশস্তা গঙ্গা। রাস্তাটি অতিশয় শুনশান, নৈঃশব্দ্য প্রায় কর্ণবিদারক, দিনের বেলায় ঝিঁঝিঁ ডাকে, রাস্তার ওপর চেরা জিভ বার করে রাজকীয়তায় চরে বেড়ায় দোয়ারকেল (Bengal monitor/Varanus

bengalensis)। আগে এই সব জায়গায় আসতে হলে সাইকেল ছাড়া গতি ছিল না, গঙ্গা বাঁধ খাচ্ছিল। স্থানীয় সাংসদ মহোদয়ের দাক্ষিণ্যে রাস্তাটি অধুনা সুসংস্কৃত, স্থানীয়রা আশা করছেন শীত পড়লেই চড়ুইভাতিকারীরা দলে দলে আসবেন ও তাতে তাঁদের জীবিকার দিগন্ত প্রসারিত হবে।

বারুদকল ময়দান গঙ্গার বাঁধের অনেকখানি নিচে এক বিশাল মাঠ, তার মধ্যে ইতিউতি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে পরিত্যক্ত বৃক্ষশোভিত অতিকায় একটি ও ছোটখাটো অনেকগুলি নির্মাণ। নির্মাণগুলি দেখলে বোঝা যায় এগুলি বাসস্থানরূপে নির্মিত হয়নি, বরং প্রধান ইমারতটির সঙ্গে কারখানারই মিল। তাকে ঘিরে ছোটখাটো একতলা ইমারতগুলি সম্ভবত কর্মীদের বাসস্থান ছিল। মৌখিক ইতিহাস বলছে এটি নবাব আলিবর্দির (১৬৭১ – ১৭৫৬) বারুদকল, এখানকার তৈরি হওয়া বারুদ জলপথে মুর্শিদাবাদ যেত। কিন্তু বিশ্বাস হল না। তখন বর্গি হামলার (১৭৪৫–১৭৪৯) যুগ, বারুদের মত লোভনীয় পদার্থ প্রেরণের পক্ষে জলপথ কতখানি নিরাপদ ছিল কে জানে! দ্বিতীয়ত আছুসাহেব বা তাঁর চিনা কর্মীদল – বারুদ তৈরিতে যাদের দক্ষতা প্রশ্নাতীত – তদবধি এসে পৌঁছননি। তৃতীয়ত, নির্মাণগুলির ইট বা প্রকৌশল দেখে তাদের কোনোভাবেই নবাব আলিবর্দির আমলের বলে মনে হল না। ছোটখাটো নির্মাণগুলির স্থাপত্যে ইসলামি ছাপ থাকলেও অতিকায় নির্মাণগুলি ব্রিটিশ জমানার বলেই মনে হল। তবে স্থানীয় বয়োজ্যেষ্ঠরা বললেন তাঁরা জ্ঞান হওয়া থেকে ইমারতগুলিকে অমনই দেখে আসছেন, তাঁদের বাপ-জ্যাঠারাও অমনটিই দেখেছেন।

কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে জানা গেছে, সেই যুগে সমুদ্রে দস্যুদের উৎপাত এত বেশি ছিল যে আত্মরক্ষার্থে প্রায় সব জাহাজই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবে বারুদ রাখত। কিন্তু কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষ চাননি যে কলকাতার মত ঘনবসতিপূর্ণ শহরে জাহাজরা বারুদ নিয়ে ঢুকুক। একটি স্ফুলিঙ্গ কী করতে পারে সেটা সাহেবরা জানতেন। তাই নিয়ম হল, কলকাতা বন্দরে ঢোকার মুখে এক নিরাপদ জায়গায় জাহাজরা তাদের বারুদ নামিয়ে রেখে কলকাতা বন্দরে ঢুকবে, আবার ফেরার সময় সেখান থেকে নিজের বারুদ তুলে নিয়ে ভেসে যাবে দূরসমুদ্রে। সেইজন্যেই এই নির্মাণ, আদতে এটি বারুদের গুদামঘর, ১৮০১ সালে লর্ড অয়েলেসলির (Richard Colley Wellesley. 20 June 1760 - 26 September 1842। বড়লাট, ১৭৯৮ – ১৮০৫) আদেশে এই বারুদঘরের স্থাপনা, ১৮৫১ সালে লর্ড ডালহৌসির (James Andrew Broun-Ramsay, 22 April 1812 - 19 December 1860, বড়লাট, ১৮৪৮ – ১৮৫৬) নির্দেশে তার সশক্তকরণ – 'তৎকালীন ক্যালকাটা গেজেটে তো তারই উল্লেখ আছে।

- ক্রমশ -

হিসাবশাস্ত্রের স্নাতকোত্তর শ্রী তপন পাল West Bengal Audit & Accounts Service থেকে অবসর নিয়েছেন সম্প্রতি। তাঁর উৎসাহের মূলক্ষেত্র রেল - বিশেষত রেলের ইতিহাস ও রেলের অর্থনীতি। সেবিষয়ে লেখালেখি সবই ইংরাজিতে। পাশাপাশি সাপ নিয়েও তাঁর উৎসাহ ও চর্চা। বোম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটি এবং ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ফ্যান ক্লাবের সদস্য শ্রী পালের বাংলায় ভ্রমণকাহিনি লেখালেখির প্রেরণা 'আমাদের ছুটি'। স্বল্পদূরত্বের দিনান্তভ্রমণ শ্রী পালের শখ; কারণ 'একলা লোককে হোটেল ঘর দেয় না।'

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011-19 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

পেলিং-এ তিনদিন

সৌমী নাগ

~ পেলিং-এর আরও ছবি ~

ডাক্তারদের জীবনে মানসিক চাপ আজকাল একটু বেশি, কখনো কখনো মনে হয় সবকিছু ছেড়ে দিয়ে চলে যাই দূরে... অজানাকে জানতে আর অদেখাকে দেখতে। বিয়ের পর থেকেই আমরা দুজন মাঝেমধ্যেই বেরিয়ে পড়ি। সেবার রওনা দিয়েছিলাম পেলিং-এর উদ্দেশ্যে। শীতের দিনে শীতের জায়গা যেতে ভীষণ ভালোবাসি। আজকের এই অতিমারির দুনিয়ার ঠিক আগে আগে ২০২০ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি বেরিয়ে পড়েছিলাম আমরা। দিনটা ছিল রবিবার, সকাল নটা দশে দমদম এয়ারপোর্ট থেকে এয়ার এশিয়ার ফ্লাইট। সাড়ে দশটার সময় নামলাম বাগডোগরা বিমানবন্দরে। ফ্লাইট একদম রাইট টাইম। লাগেজ নিয়ে বেরোতে বেরোতে এগারোটা বাজল। আগে থেকে বুক করে রাখা গাড়ি অপেক্ষা করছিল, ড্রাইভারসাহেবের নাম আমান।
এন.এইচ.-৩১ ধরে সেবক কালীবাড়ি পেরিয়ে এগিয়ে চললাম। সমতল থেকে আস্তেআস্তে পৌঁছে গেলাম পাহাড়ের আঁকাবাঁকা রাস্তায়। এরপর রাস্তায় সঙ্গী হল সুন্দরী তিস্তা। তিস্তার অপূর্ব রূপ আর আকাশী-সবুজ রঙ – চোখ ফেরানো যায় না। পথে চোখে পড়ল বাঁদরের দল। কেউবা বসে রোদ পোহাচ্ছে, কেউবা উকুন বাছতে ব্যস্ত, শিশুগুলো খেলা করছে। পাহাড়, জঙ্গল, নদী আর সর্পিল রাস্তা – আমাদের মত সমতলের মানুষদের কাছে এ যেন বিস্ময়।

কখন বেলা গড়িয়ে দুপুর হয়ে গেছে খেয়াল করিনি। কিন্তু শরীরের দাবীকেও তো উপেক্ষা করা যায় না। খেয়াল হল প্রচন্ড খিদে পেয়ে গেছে। রাস্তার ধারে একটি ছোট পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন দোকান দেখে দাঁড়ালাম। নাম লিলামানি। শরীর নামক ইঞ্জিনটির জন্য কিছু রসদ সংগ্রহ করে আবার বেরিয়ে পড়লাম। পৌঁছে গেলাম পশ্চিমবঙ্গ আর সিকিমের বর্ডারে। চেকপোস্টে সিকিম পুলিশের কিছু সাধারণ প্রশ্নোত্তরপর্বের পর আবার শুরু হল যাত্রা।
এবার পথের বাঁকে দেখা পেলাম রঙ্গিত নদীর। তিস্তার থেকে রঙ্গিতের রূপ সম্পূর্ণ আলাদা – পাথুরে, চঞ্চল – অনেক বেশি উচ্ছল। শাল-সেগুনের জঙ্গল পেরিয়ে চোখে পড়ল পাহাড়ের গায়ে গায়ে এলাচ চাষ। সুবিস্তৃত জায়গা জুড়ে শুধু এলাচ গাছের ঝোপ।

এই প্রথম দেখলাম এলাচ গাছ। দেখতে অনেকটা 'পিস লিলি' গাছের মতন। রাস্তার দুইধারে পনসেটিয়া গাছের বাহার। এই সৌন্দর্যে কোনো কৃত্রিমতার ছোঁয়া নেই। যাত্রাপথে মাঝে মধ্যেই চোখে পড়ছে ক্ষীণকায়া ঝরনা, দেখতে পেলাম কত নাম না জানা পাখি। যত দেখছি ততই যেন আরো দেখার তৃষ্ণা বেড়ে উঠছে।

পেলিং-এ পৌঁছাতে বেলা গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেল। প্রায় বিকেল চারটের সময় পৌঁছালাম হোটেলে - নিরিবিলি পাহাড়ের কোলে পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন - নাম ম্যাগপাই পাকচু ভিলেজ রিসর্ট। হোটেলকর্মীদের উষ্ণ অভ্যর্থনা এবং আতিথেয়তা মন জয় করে নিল। শুনেছিলাম হোটেলের ঘর থেকেই কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাবে। কিন্তু সেদিন দেখতে পেলাম না আকাশ মেঘলা থাকার কারণে। মন ভীষণ খারাপ হল। পাহাড়ে কিরকম ঝুপ করে সন্ধ্যা নামে। পাঁচটার সময় দেখলাম কেমন নিঝুম হয়ে গেল চারিদিক। সাতটার মধ্যে যেন গোটা শহর ঘুমিয়ে পড়ল। পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট বাড়িগুলোতে মিটমিট করে আলো জ্বলছে –মনে হচ্ছে যেন কয়েকশো জোনাকি। দুজনে ঘরে জানলার ধারে বসে কফি আর তেলেভাজা নিয়ে গল্প করছি। আলোচনা করছি পরের দিনের সাইটসিইং নিয়ে। হঠাৎ খেয়াল হল বাইরেটা জ্যোৎস্নার আলোয় ভেসে যাচ্ছে। মনে পড়ল সেদিন তো মাঘী পূর্ণিমা। ঘরের আলো নিভিয়ে জানলা খুলে দাঁড়ালাম। ঠাণ্ডা শিরশিরে হাওয়া ঢুকে আসছে। রীতিমতো কাঁপুনি ধরছে। কিন্তু সামনে যে দৃশ্য দেখলাম হয়ত সারাজীবন তার আবেশ চোখে লেগে থাকবে। জ্যোৎস্নাস্নাত কাঞ্চনজঙ্ঘা - দুধসাদা বরফের চূড়া। দুচোখ ভরে শুধু দেখতে থাকলাম। বিহ্বল হয়ে গিয়েছিলাম সেই রূপে। সম্বিত ফিরল রুমসার্ভিসের কলিং বেলে। ডিনার দিতে এসেছে একটি মেয়ে। ঘড়িতে দেখি সাড়ে নটা বেজে গেছে। খাওয়াদাওয়া শেষ করে আবার একটু জানলার ধারে বসলাম। প্রচন্ড ক্লান্তি শরীর জুড়ে, কিন্তু তবুও ইচ্ছা করছিল দেখতে... এই অপূর্ব সুন্দরকে আরও আরও দেখতে।

সকালে অ্যালার্মঘড়ির শব্দে ঘুম ভাঙল। সাড়ে পাঁচটা। তখনও অন্ধকারের চাদরমুড়ি দিয়ে আছে শহরটা। ইলেকট্রিক কেটলে জল গরম করে কাপে টি-ব্যাগ ভিজিয়ে নিয়ে বসলাম আবার ওই জানলার ধারে। অপেক্ষা এবার সূর্যোদয়ের। প্রচন্ড ঠাণ্ডা। কম্বলমুড়ি দিয়ে বসে গরম চায়ে চুমুক দিতে একটু আরাম হল। আগের দিন রাতেই ওয়েদার ফোরকাস্ট অ্যাপ থেকে দেখে রেখেছিলাম সূর্যোদয়ের সময় - সকাল ছটা দশ মিনিটে। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম পুবের আকাশ লাল হয়েছে। চেয়ারে আর বসে থাকতে পারলাম না। দাঁড়ালাম জানলা খুলে। দিগন্তে আস্তে-আস্তে ফুটে উঠছে কাঞ্চনজঙ্ঘার অবয়ব।

এই দৃশ্য মর্মস্পর্শী - জীবনের সব চিন্তা থেকে যেন মুক্তি। এক অপার প্রশান্তি আমাদের গ্রাস করে নিল। শিল্পী যেমন ক্যানভাসে রঙ নিয়ে খেলা করেন এও তাই। কোনো অজানা কিন্তু শক্তিশালী শিল্পী যেন প্রতিদিন সূর্যোদয়ের সময় কাঞ্চনজঙ্ঘাকে নতুন করে সাজিয়ে দেন তাঁর তুলির টানে আর রঙের স্পর্শে। আকাশে এখনো চাঁদ বিরাজমান। এ এক পালাবদলের ক্ষণ। আস্তে আস্তে চাঁদ পাহাড়ের পেছনে হারিয়ে গেল। পুবআকাশ ঝলমল করছে। আর কাঞ্চনজঙ্ঘা হয়ে উঠেছে স্বর্ণ-বর্ণ। সম্বিত ফিরলে মনে পড়ল ড্রাইভার-দাদা সাড়ে আটটার সময় আসবে। আজ প্রথম সাইট-সিয়িং।
বেরোতে বেরোতে প্রায় নটা বেজে গেল। পেলিং শহরটা ছবির মতন সুন্দর। সর্পিল রাস্তা, স্বচ্ছ-নীল আকাশ, ইতিউতি পাহাড়ি ঝরনা, আর কাঞ্চনজঙ্ঘার অপরূপ সৌন্দর্য। সবটুকুই যথাযথ।

প্রথমেই পৌঁছে গেলাম পেলিং স্কাই-ওয়াক। ঝকঝকে নীল আকাশ। মেঘের লেশমাত্র নেই। সামনেই কাঞ্চনজঙ্ঘা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। আর একদিকে ধ্যানমগ্ন গৌতম বুদ্ধ। পথের দুধারে রয়েছে বিভিন্ন রঙের প্রার্থনা-পতাকা।

পথ ধরে একটু হেঁটে যেতেই চোখে পড়ল সাঙ্গা-চোলিং মনাস্ট্রি। সিকিমের অন্যতম প্রাচীন মনাস্ট্রি। স্থাপিত হয় সপ্তদশ শতকে। প্রার্থনা সঙ্গীতের সুর... ঘণ্টার মৃদু শব্দ... শালগাছের মধ্যে দিয়ে হালকা বাতাসের বয়ে যাওয়া... বিভিন্ন নাম-না-জানা পাহাড়ি পাখির-কূজন... এইসব শব্দের সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে এক অপার্থিব পরিবেশ। পাশেই ছিল একটি ছোট চায়ের গুমটি। দুজনে দুকাপ চা নিয়ে বসলাম একটা ছোট টিলায়। বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে বেরিয়ে পড়লাম পরের গন্তব্যের উদ্দেশ্যে।

রিম্বি ফলস। পাহাড়ের বুক চিরে নেমেছে একটি ঝরনা। ড্রাইভারদাদার কাছে শুনলাম বর্ষাকালে ফুলেফেঁপে ওঠে এই ঝরনা, এখন সে অবশ্য অনেক শান্ত। আমরা কিছু ছবি তুললাম, ঝরনার আশপাশ থেকে কয়েকটা নুড়িও কুড়িয়ে নিলাম। তারপর আবার শুরু হল যাত্রা।

একদিকে উঁচু পাহাড় আর একদিকে গভীর খাদ। আঁকাবাঁকা পথ আর প্রত্যেক বাঁকে বিস্ময়। মাঝে মাঝে অনেক নীচে রঙ্গিত নদী দেখা যাচ্ছে। আর যখন রঙ্গিত চোখের আড়াল হচ্ছে, তার বয়ে চলার শব্দ আমাদের সঙ্গ দিচ্ছে। এভাবে অনেকটা পথ চলার পর পৌঁছে গেলাম খেচিপেড়ি লেক। আগেই শুনেছিলাম এই লেকে প্রচুর মাছ আছে। দুপ্যাকেট মাছের খাবার কিনে বেশ কিছুটা পথ জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে পৌছে গেলাম লেকে। একটি কাঠের ব্রিজ তৈরি করা আছে লেকের ওপর। ব্রিজটা লেকের ভিতর বেশ কিছুটা যায়। ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে কিছু খাবারের দানা জলে দিয়ে অপেক্ষা। একটুপরেই ঝাঁকে-ঝাঁকে মাছের দল এসে হাজির, আয়তনে তারা সকলেই বিশাল। হিন্দু এবং বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের কাছেই এই লেকের গুরুত্ব নাকি অনেক। ফেরার পথে চোখে পড়ল একটি ছোট বাচ্চা আর তার মা বসে মোমো তৈরি করছে। দুপুরে খাওয়ার সময়ও প্রায় পেরিয়ে গেছে। দুজনে বসে পড়লাম গুমটির এককোণে। ধূমায়িত মোমো আর তার সঙ্গে বাদাম-লঙ্কার চাটনি। উফফ দারুণ জমে গিয়েছিল লাঞ্চটা! খাওয়ার পর্ব মিটিয়ে আবার যাত্রা শুরু।

এরপর আমাদের গন্তব্য ছিল কাঞ্চনজঙ্ঘা ফলস। আমার মনে হয় যাত্রাপথের উন্মাদনাটাই আসল। কিছু একটা দেখার আগে সেই জিনিসটা সম্পর্কে মনের কল্পনা, মনের ক্যানভাসে নানারকমের আঁকিবুকি কাটা – তার মজাটাই আলাদা। পথের দুধারে অসংখ্য এলাচ গাছ। কিরকম যেন অযত্নেই বেড়ে উঠেছে। ধীরে ধীরে রোদ্দুর চলে গেল। বেলা প্রায় শেষ হয় হয়... ঠাণ্ডাও বেশ বেড়ে গিয়েছে; গন্তব্যে পৌঁছানোর কিছু দূর থেকেই শব্দ পেলাম – দুর্নিবার দুরন্ত গতিতে জল পড়ার শব্দ। মনের উত্তেজনার পারদ আরও বাড়ল। অবশেষে পৌঁছলাম জলপ্রপাতের সামনে। অবিশ্রান্ত ধারায় চঞ্চলগতিতে পাথর

কাঞ্চনজঙ্ঘার বরফগলা জল, তাই সারা বছর এর প্রবাহ মোটামুটি একই রকম থাকে; তবে বর্ষাকালে ভয়ংকর হয়ে ওঠে। প্রপাতের ঠিক নীচে তৈরি হয়েছে একটি ছোট জলাধার। তারপর আবার জলধারা প্রবাহিত হয়েছে নিজের ছন্দে বিশাল বিশাল পাথরগুলোর আনাচ-কানাচ দিয়ে; যেখানেই যাই, চেষ্টা করি কিছু স্মৃতি সংগ্রহ করার। এখান থেকেও কুড়িয়ে নিলাম নুড়ি-পাথর, আর এই কর্মসাধন করতে গিয়ে বরফশীতল জলের স্পর্শে খানিক ভিজেও গেলাম। শীতে কাঁপতে-কাঁপতে দুজনে গেলাম পাহাড়ের কোলে অবস্থিত একটি গুমটিতে। গরম দুকাপ কফি সেবন করে ধড়ে প্রাণ ফিরে পেলাম... আবার শুরু হল যাত্রা।

রাবডেন্টসে রুইনস। এটি হল সিকিম রাজার দ্বিতীয় রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ। ১৬৭০ থেকে ১৮১৪ সাল অবধি এখানেই ছিল সিকিমের রাজধানী। পৌঁছলাম যখন দিনের আলো প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। পাহাড়ি সরু রাস্তা আর দুপাশে সারি দিয়ে গাছ। জায়গাটাতে অন্ধকারটা যেন একটু বেশিই। আলো-আঁধারির মধ্যে দিয়ে বেশ কিছুটা হেঁটে অবশেষে পৌঁছালাম মূল গন্তব্যে। গা-টা ভালোই ছমছম করেছিল ... তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম গাড়িতে।
সারাদিনের ঘোরাঘুরিতে শরীর বেশ ক্লান্ত। মন চাইছিল হোটেলের ঘরের জানলার ধারের চেয়ার আর তার সঙ্গে একটা স্ট্রং কফি। ফিরে এসেই তাই প্রথমে কফি আর স্ন্যাকস অর্ডার করলাম। তারপর ফ্রেশ হয়ে নিয়ে কফির কাপ হাতে দ্বৈতআড্ডা। সারাদিনের অভিজ্ঞতার আলোচনা, নিজেদের গল্প, প্রাত্যহিক জীবনের ব্যস্ততায় যে গল্পগুলো করা হয়না সেইসব গল্প। প্রত্যেকটা মুহূর্তে একে অপরের পাশে থাকার অনুভূতি নিয়ে সন্ধ্যেটা বেশ কেটে গেল।
পরেরদিন সকালে ঘুম ভাঙতে দেরি হল। তাই আর সূর্যোদয় দেখা হল না। মনটা একটু খারাপ হল, নিজেদের ওপর খুব রাগও হচ্ছিল। কিন্তু সারাদিন অন্যান্য আরও অনেক কিছু করার ছিল, অনেক নতুন জায়গা দেখার ছিল। তাই মনখারাপ ভুলে গিয়ে তাড়াতাড়ি তৈরি হলাম দুজনে। ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়ে পড়লাম দ্বিতীয় দিনের সাইট-সিয়িং-এর জন্যে।
প্রথমেই পৌঁছে গেলাম পেমইয়াংসি মনাস্ট্রি। এটিও সিকিমের একটি অন্যতম প্রাচীন মনাস্ট্রি। সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে এটি প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। পেলিং শহরটার বৈশিষ্ট্য হল যে প্রায় সব দ্রষ্টব্যস্থান থেকেই কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়। কাঞ্চনজঙ্ঘার সৌম্যসুন্দর মূর্তি যতই দেখি ততই বিহ্বল হই। পুরো পরিবেশটায় এক অদ্ভুত শান্তি বিরাজ করছে। ধ্যান করার জন্য এ হল আদর্শ পরিবেশ; ওখানকার সন্ন্যাসীদের মুখে শুনলাম এখানে নাকি অনেক বিদেশিদের সমাগম হয়। তাঁরা এখানে আসেন আত্মদর্শন করতে, নিজেদের অন্তরাত্মাকে খুঁজে পেতে। মনাস্ট্রিতে অনেক সন্ন্যাসীর বসবাস। যখন পৌঁছেছিলাম সেটি ছিল মঠের প্রার্থনার সময়। আবাসিক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা ছাড়াও স্থানীয় মানুষও ছিলেন প্রার্থনাগারে। মনাস্ট্রির চতুর্দিকে খুব সুন্দর বাগান আর ওই বাগানের এক কোণ থেকে রাবডেন্টসে রুইনের এর কিছু অংশ দেখা যায়। ধূপ-ধুনো-কর্পূরের গন্ধে পরিবেশ হয়ে উঠেছিল আরও মোহময়, আরও পবিত্র।
এরপর দেখতে গেলাম পেলিং হেলিপ্যাড। নিয়মিত কোনো হেলিকপ্টার পরিষেবা নেই এখান থেকে। স্থানীয়দের কাছে শুনলাম কোনও এমার্জেন্সি ছাড়া এখানে হেলিকপ্টার অবতরণ করেনা; তবে এখান থেকে একদিকে দেখা যায় কাঞ্চনজঙ্ঘা আর একদিকে দেখা যায় পাহাড়ের গায়ে ছড়িয়েছিটিয়ে থাকা জন-বসতি, কোথাওবা পাইন বন, আবার কোথাওবা সোপান-কৃষির নিদর্শন।
এরপর যাত্রা শুরু হল সিংসোর ব্রিজের দিকে। ড্রাইভার দাদা বললেন, সময় লাগবে প্রায় দেড় ঘণ্টা। অনেকটা ঘুরপথে যেতে হবে কারণ পরিচিত রাস্তাটা কিছুদিন আগে ধ্বসে নষ্ট হয়ে গেছে। যাই হোক যাত্রা শুরু হল। প্রচন্ড খারাপ রাস্তা। ঝাঁকুনিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত। রাস্তায় মাঝেমধ্যে দাঁড়িয়ে ছবিও তুললাম অনেক। কিছুদূর গিয়ে চোখে পড়ল একটি নাম-না-জানা পাহাড়ি ঝরনা। খরস্রোতা এবং চঞ্চলা। স্বচ্ছ কাচের মতন তার জল। রিমবি বা কাঞ্চনজঙ্ঘা ফলসের থেকে রূপে কিছু কম যায় না কিন্তু এখনও পরিচিত পর্যটন-আকর্ষণ হয়ে ওঠেনি। সেখানে কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে আবার যাত্রা শুরু করলাম। অনেকখানি পথ পেরিয়ে পৌঁছে গেলাম সিংসোর ব্রিজ - এশিয়ার দ্বিতীয় উচ্চতম ঝুলন্ত সেতু। বলা হয় এর উচ্চতা ১০০ মিটার আর প্রায় ২০০ মিটার লম্বা। দুটি বিশাল পাহাড়ের মাঝে অবস্থিত এই ব্রিজের মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়ালে নীচে দেখা যায় গভীর জঙ্গল আর তার মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে এক দুর্দান্ত নাম-না-জানা নদী। দুদিকের পাহাড়ে এলাচ গাছের ঝোপ নয়তো ধাপ-চাষের নিদর্শন। আকাশ বেশ মেঘলা ছিল, কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস বইছিল। কখনো কখনো ঝিরঝির করে বৃষ্টিও পড়ছিল। আবার একটি মোমোর দোকান পেয়ে গেলাম। মোমো তখনও তৈরি হয়নি। তাই প্রথমে খেলাম থুকপা। নুডুলস আর বিভিন্ন সবজি দিয়ে বানানো অতি সাধারণ একটি খাবার কিন্তু খুব সুস্বাদু। তারপর খেলাম চিকেন মোমো। আর সব শেষে এককাপ করে গরম চা।

সিংসোর থেকে বেরিয়ে পড়লাম ডেন্টাম গ্রামের উদ্দেশ্যে। ড্রাইভারদাদা একটি ভিউপয়েন্টে নিয়ে গেল যেখান থেকে পুরো ডেন্টাম উপত্যকা দেখা যায়। বিস্তীর্ণ উপত্যকায় সরষে, ভুট্টা ইত্যাদির চাষ হয়েছে। উপত্যকার আর এক দিকে ছোট ছোট বাড়ি, স্কুল, বাজার ইত্যাদি। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা নেমে এল।
পেলিং শহরে এসে ইচ্ছে হল স্থানীয় বাজারটা একটু ঘুরে দেখতে। নেমে পড়লাম বাজারে। ছোট্ট বাজার। কয়েকটা নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দোকান, কিছু ট্রাভেল এজেন্সি, ফাস্টফুডের দোকান, আর কিছু স্থানীয় হস্তশিল্পের দোকান। হাতে তৈরি ধূপ কিনলাম। বাকি জিনিসের দাম অস্বাভাবিক বেশি বলে মনে হল। ক্লান্ত শরীরে হোটেলে পৌঁছলাম।
আজ শেষ রাত্রি এখানে। তাড়াতাড়ি জিনিসপত্র গুছিয়ে ডিনার করে শুয়ে পড়লাম।
পরদিন সকালে আমরা বেরিয়ে পড়লাম বাগডোগরা বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে। মনে অনেক ভালোলাগা নিয়ে আর আবার ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় জানালাম কাঞ্চনজঙ্ঘাকে।

~ পেলিং-এর আরও ছবি ~

পেশায় চিকিৎসক সৌমী নাগ ভালোবাসেন কাজের ফাঁকে একটু ছুটি মিললেই বেড়াতে যেতে।

Comments

লাজবাব লাচুং

অরিন্দম পাত্র

~ লাচুং-ইয়ুমথাং-এর আরও ছবি ~

যতগুলি পাহাড়ি জায়গা ঘোরা আছে, তাদের মধ্যে উত্তর সিকিমের লাচুং (৯০০০ ফিট) নিঃসন্দেহে খুব ওপরের দিকেই জায়গা করে নেবে। এত সুন্দর, নিরালা ছবির মত পাহাড়ি গ্রাম আর দুটি দেখিনি!
ঘন্টাছয়েক জার্নি করে এসে পৌঁছেছি লাচুং-এ। গ্যাংটক থেকে গাড়িতে যাত্রা শুরু হয়েছিল বেলা এগারোটা নাগাদ, আর হোটেলে এসে পৌঁছলাম প্রায় সাড়ে পাঁচটায়। ক্লান্ত অবসন্ন দেহ হলেও মনমেজাজ ছিল কিন্তু একদম ফুরফুরে। তার কারণ গতকালের ছাঙ্গু লেকের সেই বৃষ্টি যা গ্যাংটক অবধি ধাওয়া করেছিল, সেটা আর নেই। বরং প্রকৃতির অপরূপ শোভা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে লাচুং আসার পথের প্রতিটি বাঁকে বাঁকে!
দুইয়ে মিলিয়েমিশিয়ে মেজাজ একদম শরিফ ছিল। লাচুং-এর হোটেলে ঢুকছি, যেন স্বাগত জানাল বিশালাকার মেঘঢাকা পাহাড়! হোটেলের ঠিক সামনেই এরকম চমৎকার ভিউ দেখতে পেয়ে সবাই আরও খুশি হয়ে উঠলাম!
সেদিনকার মত হোটেলের ঘরেই বিশ্রাম নেওয়া মনস্থির করলাম, পরেরদিন কঠিনপথে যাত্রা – ইউমথাং ভ্যালি ও জিরো পয়েন্ট!
সকালে কেন জানিনা খুব তাড়াতাড়িই ঘুম ভেঙে গেল, আড়মোড়া ভেঙে জানলা দিয়ে অভ্যাসবশত উঁকি মেরে অবাক হয়ে গেলাম! প্রকৃতি রূপের ডালি সাজিয়ে নতুন দিনকে স্বাগত জানাচ্ছে! উল্টোদিকের পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে আকাশ একটু একটু করে রাঙা হয়ে উঠছে! দূরের বরফাবৃত শৃঙ্গগুলি একেবারে মেঘহীনভাবে সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে!
তাড়াতাড়ি চোখেমুখে জল দিয়ে ক্যামেরা নিয়ে একছুটে চলে গেলাম হোটেলের ছাদে। আমাদের রুম ছিল একদম টপ ফ্লোর অর্থাৎ চারতলাতে।

যত পারলাম স্ন্যাপশট নিলাম আশ মিটিয়ে। দূরের পাহাড়ের গা বেয়ে নিরন্তর নেমে আসছে দুর্দান্ত এক পাহাড়ি ঝরনা। সে যে কোন আদি-অনন্তকাল থেকে এরকমভাবে ঝরে পড়ছে কে জানে! পাশ থেকেই শোনা যাচ্ছে কুলকুল করে বয়ে যাওয়া লাচুং নদীর সঙ্গীত! আস্তে আস্তে লাচুং ভ্যালিতে নেমে আসছে দিনের প্রথম আলো!
অদ্ভুত সুন্দর স্বর্গীয় ছিল সেই সকাল! কিন্তু প্রকৃতির রঙ, রূপ, রসের স্বাদ আহরণ আপাতত বন্ধ থাক এখনকার মত, নীচ থেকে ডাক আসছে, তৈরি হয়ে বেরোতে হবে এখনই।

দিকশূণ্যপুর যাত্রা...

জিরো পয়েন্টের বাংলা নাম কি হবে ভাবতে ভাবতে এই নামটা মাথায় এল ক্যাজুয়ালি! খারাপ শুনতে লাগলে নিজগুণে মাফ করে দেবেন!
আমাদের বোলেরো গাড়ি প্রস্তুত, বেরিয়ে গাড়িতে উঠতে যাব, হঠাৎ দেখি পাশের নীচতলার ঘরে বাকিরা সবাই শশব্যস্ত হয়ে জটলা করছে! কৌতূহলী হয়ে গিয়ে দেখি সবাই বিরাট ভাড়ার গামবুট পছন্দ করছে। বাকিদের দেখাদেখি একজোড়া নীলরঙের গামবুটে পা গলালাম। কিন্তু জিনিসটা মোটেও পছন্দসই হল না।
গাড়ি ছেড়ে দিল, যাত্রা শুরু হল। পাহাড়ি সেই রাস্তা যেমন সুন্দর তেমনই ভয়ঙ্কর! কখনো একদিকে খাদ, তো বাঁক পেরিয়েই আবার অন্যদিক থেকে অতলান্ত খাদ হাঁ করে রয়েছে! শুরুর দিকে সবুজের সমারোহ ছিল দেখার মত। কিন্তু যত ওপরে উঠছি তত যেন সবুজের পরিমাণ ভয়ানকভাবে কমে আসছে। রুক্ষ, শুষ্ক হয়ে আসছে চারিদিক!

মাঝে এক জায়গা পছন্দ হতে ড্রাইভার সাহেবকে বলেকয়ে দাঁড় করালাম ছবি তোলার জন্য! কিন্তু এ রাস্তায় বেশিক্ষণ দাঁড়াতেও চাননা ড্রাইভারেরা, তাঁদের লক্ষ্য থাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেলা থাকতেই যাতে ওপর থেকে ঘুরিয়ে ভালোয় ভালোয় নিচে নামানো যায়।
প্রায় ঘন্টা দুই-আড়াই লাগল ইউমথাং পৌঁছতে, কিন্তু প্রথমে যাব জিরো পয়েন্ট! তাই গাড়ি থামল না। এগিয়ে চললাম, ঠিক যেন অজানার উদ্দেশ্যে! চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে কত যে অসাধারণ সব ল্যান্ডস্কেপ ফ্রেম! যেখানে সেখানে থামা যাবে না, তাই বাধ্য হয়ে গাড়ির জানলার কাঁচ নামিয়েই ক্যামেরার শাটার খচাখচ চালাতে লাগলাম। কিন্তু এত প্রচণ্ড ঝাঁকুনি সেই পাথুরে রাস্তার, যে কী আর বলব!
অবশেষে এসে পৌঁছলাম ১৫৩০০ ফিট উচ্চতায় জিরো পয়েন্ট - দিকশূণ্যপুর! গাড়ি থেকে যখন নামলাম শরীরের শক্তিও জিরো হয়ে গেছে যেন! মাথা অল্প অল্প ঘুরছে। ধাতস্থ হতে বেশ খানিকটা সময় নিলাম। চারদিকে তাকিয়ে দেখি গাড়ি আর মানুষের সে যেন এক হট্টমেলা বসেছে! দূরের বরফঢাকা পর্বতশৃঙ্গগুলি মেঘের আচ্ছাদন ভেঙে মাঝেমাঝে দৃশ্যমান হচ্ছে, ফের ঢাকা পড়ে যাচ্ছে মেঘচাদরে।

খেয়াল করলাম যে শ্বাসকষ্ট না হলেও স্বাভাবিক ভাবে চলাফেরা করতে অল্পস্বল্প অসুবিধে হচ্ছে। রোটাং পাসে (১৩০০০ ফিট) খুব তাড়াতাড়ি চলাফেরা করতে অসুবিধে হয়নি। কিন্তু এখানে অসুবিধে উপলব্ধি করলাম কিছুটা। তাড়াহুড়ো করে আশেপাশের পাহাড়ি ছোট উঁচু জায়গায় ওঠা গেল না, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চারিদিকের বেশ কিছু ছবি নিলাম। বেশ অনেকটা দূরে প্রচুর বরফের মাঝে অনেকে খেলাধুলা করছে দেখা গেল। কিন্তু ওই ভারি গামবুট টেনে টেনে অত দূরে

ড্রাইভার সাহেবের বরাদ্দ করা পঁয়তাল্লিশ মিনিট থেকে এক ঘন্টা শেষ হতে উঠে পড়লাম গাড়িতে। এবার উৎরাই নামা... গন্তব্য ইউমথাং ভ্যালি। ইউমথাং উপত্যকায় এসে পৌঁছলাম যখন বেশ বেলা হয়ে গেছে। মেঘের চাদরে ঢেকে গেছে গোটা উপত্যকা! এদিক ওদিক চড়ে বেড়াচ্ছে ইয়াকের দল, মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে পাহাড়িয়া নদী! মার্চ-এপ্রিলে নানা রঙের রডোডেনড্রন ফুলে ঢাকা পড়ে ইউমথাং – তাই এর আরেক নাম 'ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স'।
বেশ খানিকক্ষণ ইউমথাং-এর অপার সৌন্দর্য উপভোগ করলাম। এবার ফিরে চলার পালা – বিদায় নর্থ সিকিম। কাশ্মীর আমি যাইনি কখনো, জানিনা কোনোদিন যেতে পারবও কিনা। কিন্তু আমার কাছে তুমিই ভূস্বর্গ!

~ লাচুং-ইয়ুমথাং-এর আরও ছবি ~

পেশায় চিকিৎসক (নাক কান ও গলাবিশেষজ্ঞ) অরিন্দম পাত্রের নেশা ছবি তোলা। এছাড়াও দেশের মধ্যে নানা জায়গায় ভ্রমণ করা তাঁর আর এক শখ।

Comments

Name

ভিয়েনা – এক ঐতিহ্যমণ্ডিত আভিজাত্য

কণাদ চৌধুরী

~ ভিয়েনার আরও ছবি ~

চেক রিপাবলিকের রাজধানী প্রাগ শহরে তিনদিন কাটিয়ে এক সকালে ট্রেনে চেপে চলেছি অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনার দিকে। দ্রুতগামী রিজিওজেট ট্রেনের কামরার গবাক্ষপথে নজরে পড়ছে পথের ধারের ক্রমাগত অপসৃয়মান নয়নাভিরাম দৃশ্যপট, ঝলমলে রৌদ্রকরোজ্জ্বল গ্রীষ্মের দিনে ইউরোপের গ্রামাঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী আক্ষরিক অর্থেই তুলনাহীন, বিশেষ করে এই রেলযাত্রায় প্রথমে চেক রিপাবলিক এবং পরে অস্ট্রিয়ার গ্রামাঞ্চলের অনুপম সৌন্দর্য চোখে মায়াকাজল পরিয়ে রাখে। নীল আকাশের নিচে সবুজের গালিচাবিছানো প্রান্তর, তার মাঝে লাল টালির ছাদের বাড়ি দিয়ে সাজানো ছবির মতো সুন্দর এক-একটা গ্রাম, সেই বাড়িগুলোর মাঝে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে গ্রামের গির্জার সবুজ বা কালো তীক্ষ্ণ চূড়া, সবুজ ঘাসের ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে রীতিমত স্বাস্থ্যবান গবাদি পশুর দল, কখনো দূরে চোখে পড়ছে টিলার মাথায় পুরোনো কোনও প্রাসাদ বা কেল্লা, মনে হয় অজস্র পিকচার পোস্টকার্ডের এক চলচ্ছবি চলেছে পুরো সময়টা ধরে। ট্রেনের জানলায় চোখ রেখে সেই অনবদ্য পথশোভায় বুঁদ হয়ে থাকতে থাকতে কোথা দিয়ে যে প্রায় চারঘণ্টা সময় কেটে গেল, বোঝাই গেল না।

উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম, চারদিকে দুটি দুটি করে মোট আটটি দেশ দিয়ে ঘেরা অস্ট্রিয়া মধ্য ইউরোপের একটি গুরুত্বপূর্ণ দেশ, আল্পস পর্বতমালার পাহাড়ি ভূপ্রকৃতি দিয়ে সজ্জিত এই দেশটির নৈসর্গিক দৃশ্যের খ্যাতি রয়েছে সারা বিশ্বে। এ দেশের ভিয়েনা, ইনসব্রুক এবং সালজবুর্গ, এই তিনটে শহরই পর্যটকদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়। এর মধ্যে ভিয়েনা শুধু যে অস্ট্রিয়ার রাজধানী তাই নয়, ইউরোপের সাংস্কৃতিক রাজধানীও বলা যায় একে। ইউনাইটেড নেশনসসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর ভিয়েনায় অবস্থিত, রয়েছে বেশ কিছু খ্যাতনামা আর্থিক সংস্থা এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদরদপ্তরও। মিউজিয়াম, চার্চ, বারোক স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত প্রাসাদ, উদ্যান, অজস্র সুন্দর অট্টালিকা, অভিজাত অপেরাহাউস আর কফিহাউসে সজ্জিত ভিয়েনা পর্যটকদের দৃষ্টিকোণ থেকে ইউরোপের এক অবশ্যদ্রষ্টব্য শহর। বিশিষ্ট জার্মান নাট্যকার বার্টল্ট ব্রেখট ভিয়েনা সম্পর্কে বলেছিলেন – 'গোটাকতক কফিহাউসের চারপাশ দিয়ে বানানো একটা ছোট শহর, যে কফিহাউসগুলোতে স্থানীয় লোকেরা একত্রে বসে খবরের কাগজ পড়ে।' কফিহাউসের খ্যাতি ছাড়াও ভিয়েনার রয়েছে অতি সমৃদ্ধ এক সাংগীতিক ঐতিহ্য, যার জন্যে ভিয়েনাকে 'সিটি অফ মিউজিক' বলা হয়ে থাকে। 'ওয়াল্টজ' নৃত্যের জন্ম ভিয়েনায়, আর পাশ্চাত্য সংগীতের যেসব দিকপাল সংগীতজ্ঞের নাম জড়িয়ে আছে ভিয়েনার সঙ্গে, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন উল্ফগাঙ্গ আমাদেউস মোজার্ট, ফ্রাঞ্জ শুবার্ট এবং পিতা-পুত্র দুই য়োহান স্ট্রস – সিনিয়র ও জুনিয়র।

রাত নটা অবধি, ঘুরে বেড়াতে কোনো সমস্যাই নেই। ভিয়েনা এইচবিএফ বা ভিয়েনা সেন্ট্রাল রেল স্টেশন থেকে আমাদের অ্যাপার্টমেন্ট বিশেষ দূরে নয়। অ্যাপার্টমেন্টের মালিক আগেই বলেই দিয়েছিলেন দরজা খোলার কোড নম্বর এবং কোথায় চাবি থাকবে। জিনিসপত্র ঘরে রেখে নিকটবর্তী মেট্রো স্টেশন থেকে মেট্রো ধরে চললাম দিনের প্রথম গন্তব্য 'রিংস্ট্রাস' – শহরের ঐতিহাসিক 'ইনার স্ট্রাড' বা 'ইনার সিটি'-কে বেষ্টন করা এক বৃত্তাকার অভিজাত তরুবীথি, যার দুইপাশে রয়েছে ভিয়েনা শহরের কিছু ঐতিহাসিক ইমারত, নজরকাড়া বারোক শৈলীর স্থাপত্যের জন্যে যেগুলো বিখ্যাত। রিংট্রামে চড়ে বসলে সেই ট্রাম এই রিংস্ট্রাস বরাবর চলতে থাকে, ট্রামের আসনের সঙ্গেই রয়েছে হেডফোন, কানে লাগালে শোনা যায় সেইসব পুরোনো বাড়িঘরের প্রধান প্রধানগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনাসম্বলিত ধারাবিবরণী। রিংট্রামে চড়ে এক চক্কর ঘুরে আসা হল রিংস্ট্রাস, ট্রাম থেকেই পরিচিত হওয়া গেল 'স্টেট অপেরা', 'সিটি হল', 'পার্লামেন্ট', 'হফবুর্গ প্রাসাদ', 'আর্ট হিস্ট্রি মিউজিয়াম' এবং 'ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়াম'-এর মতো কয়েকটি বিখ্যাত অট্টালিকার বাইরের চেহারাটার সঙ্গে। এদের কয়েকটিকে পরে আরও নিকট থেকে দেখার সুযোগ হয়েছিল।

ট্রাম থেকে নেমে এবার হাঁটার পালা। রিংস্ট্রাসকে বলা হয়ে থাকে বিশ্বের অন্যতম সেরা ব্যুলেভার্ড, সেই তরুবীথি ধরে রাস্তার দুপাশের বাড়িগুলোর জমকালো স্থাপত্যের দিকে নজর রাখতে রাখতে পৌঁছে গেলাম 'স্টাডপার্ক' বা 'সিটি পার্ক'। 'উইয়েনফ্লস' বা উইয়েন নদী এই পার্ককে দুটো ভাগে ভাগ করেছে। সুন্দর পার্কটিতে রয়েছে বেশ কয়েকজন সঙ্গীতস্রষ্টার স্মৃতিসৌধ, যার অন্যতম হল 'ওয়াল্টজ'-এর রাজা য়োহান স্ট্রস জুনিয়রের গিল্টিকরা ব্রোঞ্জের মূর্তিটি। সিটি পার্কের পরের গন্তব্য ছিল তিনশো বছরের পুরোনো 'কার্লস্কিরসে' বা 'সেন্ট চার্লস চার্চ'। সুউচ্চ বিশাল গম্বুজ আর দুটো মিনার নিয়ে বারোক শৈলীতে তৈরি এই গির্জাটি ভিয়েনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক স্মারক।

'কার্লস্কিরসে' গির্জাতে নিয়মিত সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে। আমরা যেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলাম, সেই সন্ধ্যায় 'অর্কেস্ট্রা ১৭৫৬' আয়োজিত 'মোজার্ট রিকুইয়েম' শোনার ব্যবস্থা ছিল, টিকিটের দাম জনপ্রতি বারো ইউরো, তাও সেটা একেবারে পিছনের সারিতে দাঁড়িয়ে অনুষ্ঠান দেখার জন্য, আসনে বসে দেখার টিকিট আরও মহার্ঘ। খুব নামী-দামী অর্কেস্ট্রার অনুষ্ঠানের টিকিট আমাদের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে, তাছাড়া সেইসব টিকিট অনুষ্ঠানের অনেকদিন আগে থেকেই নিঃশেষ হয়ে যায়। এটি সেরকম খ্যাতনামা কোনও অর্কেস্ট্রার অনুষ্ঠান না হলেও, ভিয়েনায় বসে মোজার্টের সংগীত একটু উপভোগ করার প্রলোভন এড়াতে না পেরে কেটে ফেলা হল টিকিট। ভিতরে ঢুকে আমরা তো একেবারে পিছনের দিকে গির্জার মেঝের ওপরেই বসে পড়লাম, ভাবলাম অনুষ্ঠান শুরু হলে উঠে দাঁড়ানো যাবে। আমাদের পরনের ভারতীয় পোশাক দেখে আকৃষ্ট হয়েই সম্ভবত আয়োজকরা অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগেই আমাদের মাঝামাঝি সারির আসনে বসিয়ে দিলেন অতিরিক্ত কোনো পয়সা না নিয়েই! সুতরাং অনুষ্ঠানটা আমাদের আর দাঁড়িয়ে দেখতে হয়নি। গির্জার অভ্যন্তরের ধ্বনিপ্রক্ষেপণ ব্যবস্থার তারিফ করতে হয়, প্রায় জনা-পঞ্চাশেক যন্ত্রীর বাজনা কোনো বৈদ্যুতিন সরঞ্জামের সাহায্য ছাড়াই নিখুঁতভাবে শ্রোতাদের কানে পৌঁছে যাচ্ছিল। একঘণ্টা ধরে মন্ত্রমুগ্ধের মতো শোনা হলো সেই বাজনা, আর সেই সঙ্গে এক ঝলক দেখেও নেওয়া হলো কার্লস্কিরসের অভ্যন্তরের অনবদ্য অলঙ্করণ।

দ্বিতীয় দিনে ভিয়েনায় দ্রষ্টব্য-তালিকায় প্রথমে ছিল 'স্কুস বেলভেডিয়ার' বা বেলভেডিয়ার প্রাসাদ। বারোক শৈলীতে তৈরি দুটি অট্টালিকা, যার একটির নাম 'আপার বেলভেডিয়ার' এবং দ্বিতীয়টি 'লোয়ার বেলভেডিয়ার'। দুইয়ের মাঝে প্রচুর মর্মর মূর্তি, ফোয়ারা আর ছোট ছোট জলপ্রপাত দিয়ে সুসজ্জিত বিস্তীর্ণ সবুজ উদ্যান।

'আপার বেলভেডিয়ার' বর্তমানে একটি শিল্প-সংগ্রহশালা, মধ্যযুগ থেকে সাম্প্রতিককাল অবধি অস্ট্রিয়ার চিত্রশিল্পীদের আঁকা ছবির এক বিশাল সংগ্রহ এখানে প্রদর্শিত আছে। অস্ট্রিয়ান শিল্পী গুসতাভ ক্লিম্ট এবং এগন শিল-এর আঁকা ছবির সঙ্গে রাখা আছে ক্লদ মনেট, ভিনসেন্ট ভ্যানগগ, পিয়ের রেনোয়া-র আঁকা কয়েকটি ছবিও। সেখান থেকে ফিরে ভিয়েনার কেন্দ্রীয় অঞ্চলে এসে দেখা হলো 'বুর্গগার্টেন'-এ অবস্থিত প্রায় পঁচিশ ফিট উঁচু মোজার্টের মর্মর মূর্তিটি। প্রায় দেড়শো বছর আগে গোথিক স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত ভিয়েনার 'সিটি হল' এই শহরের অজস্র সুন্দর সুন্দর স্থাপত্যের অন্যতম সেরা নিদর্শন। গোথিক ক্যাথিড্রালের অনুকরণে নির্মিত পাঁচটি মিনারের মধ্যে মাঝেরটির উচ্চতা প্রায় তিনশো কুড়ি ফিট। এই 'সিটি হল' বর্তমানে ভিয়েনা শহরের মেয়রের কার্যালয়। একটি চলচ্চিত্র-উৎসব চলার কারণে অট্টালিকাটির প্রধান প্রবেশপথের সামনে টাঙানো ছিল একটি সুবিশাল পর্দা, যার ফলে এই অসামান্য স্থাপত্যটির চিত্তাকর্ষক চেহারাটা সম্পূর্ণভাবে চোখে ধরা দিচ্ছিল না কিছুতেই।

সিটি হলপ্রাঙ্গণে মেলা বসে গিয়েছে প্রচুর খাবারের দোকানের, সেখানে আমরাও একটু গলা ভিজিয়ে নিলাম। এর ঠিক বিপরীত দিকেই রয়েছে ভিয়েনার 'বুর্গথিয়েটার' বা 'ইমপেরিয়াল কোর্ট থিয়েটার'। মার্বেলপাথরে নির্মিত এই বাড়িটির বহির্ভাগের 'করিন্থিয়ান' পিলারগুলি আর জানলার উপরিভাগে স্থাপিত বিভিন্ন নাট্যব্যক্তিত্বদের আবক্ষমূর্তি নজর কাড়ার মতো।

শহরের একেবারে ভৌগোলিক কেন্দ্রস্থল 'স্টিফেনপ্লাতজ'-এ অবস্থিত প্রায় চল্লিশ-হাজার বর্গফিট জায়গার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা 'স্টিফান্সডম' বা সেন্ট স্টিফেন্স ক্যাথেড্রাল ভিয়েনা শহরের আরেক আকর্ষণ। ১১৩৭ খ্রিস্টাব্দে তৈরি হওয়ার পরে ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে অগ্নিকাণ্ডের ফলে একবার এবং তার পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আরও একবার গির্জাটি প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এখন যে অবস্থায় আমরা এই স্থাপত্যটিকে দেখতে পাই, সেটি এর পুনর্নির্মিত রূপ। গির্জার দক্ষিণের চূড়াটি প্রায় সাড়ে চারশো ফিট উঁচু, বিভিন্ন রঙের টালিতে অলঙ্কৃত এই গির্জার ছাদে আঁকা আছে ভিয়েনা শহর এবং রাজ-পরিবারের প্রতীকচিহ্ন।

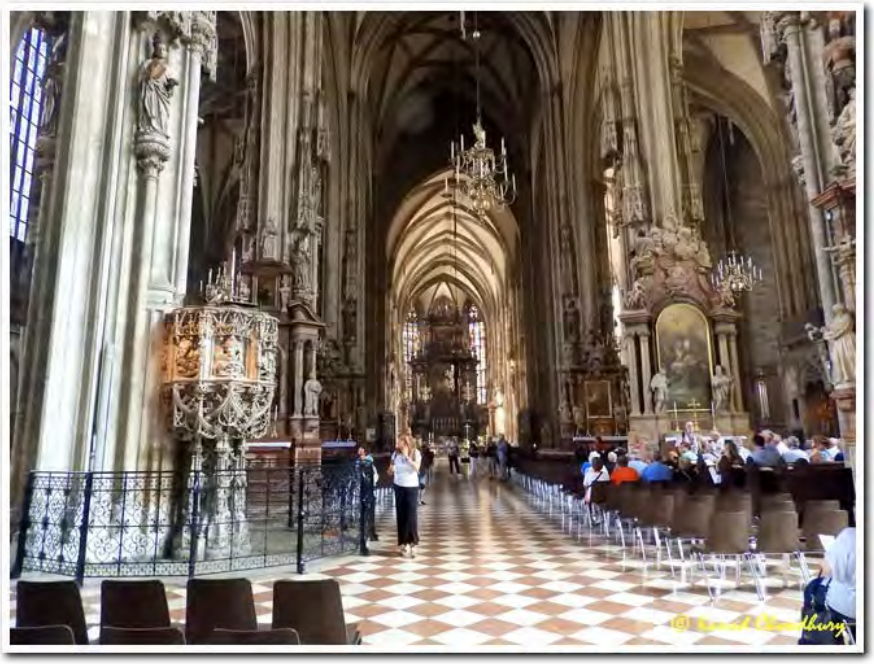

সুবিশাল অভ্যন্তরের দর্শনীয় সবকিছু ভালভাবে ঘুরে দেখতে গেলে সারাটা দিন লেগে যাবে। বাইরে স্টিফেনপ্লাতজ সংলগ্ন স্যুভেনিরের দোকানগুলো গিজগিজ করছে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা পর্যটকদের ভিড়ে, ঘণ্টাখানেক সেখানে কাটিয়ে আবার ফিরে আসা হল 'হেলডেনপ্লাতজ' এলাকায় 'হফবুর্গ' বা 'হাবসবুর্গ' শাসকবংশের প্রধান প্রাসাদগুলি দেখতে। অস্ট্রিয়ার রাষ্ট্রপতির সরকারি আবাসস্থল এবং কার্যালয় এখানেই অবস্থিত। এটি অনেকগুলো সুবিশাল অট্টালিকার সমষ্টি, যার মধ্যে রয়েছে রাজকীয় গির্জা, কোষাগার, গ্রন্থাগার, অশ্বশালা ও একটি অশ্বারোহণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এই প্রাসাদশ্রেণীর সবচাইতে প্রাচীন অংশটি নির্মিত হয়েছিল তেরশো খ্রিস্টাব্দে। কাছেই রয়েছে সম্রাজ্ঞী মারিয়া থেরেসার নামাঙ্কিত 'মারিয়া-থেরেসিয়ান প্লাতজ', যেখানে আছে সম্রাজ্ঞীর মূর্তিসম্বলিত একটি স্মৃতিসৌধ আর রয়েছে ভিয়েনার অপর দুইটি বিখ্যাত সংগ্রহশালা, 'নেচারহিস্টরিসেশ মিউজিয়াম' বা ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়াম এবং 'কুন্সহিস্টরিসেশ মিউজিয়াম' বা আর্ট হিস্ট্রি মিউজিয়াম। সময় এবং অর্থ, উভয়েরই অপ্রতুলতার কারণে কোনও মিউজিয়ামেরই অভ্যন্তরে প্রবেশ করা হয়নি, বাইরে থেকে তাদের অসাধারণ স্থাপত্যের চেহারাটুকু দেখেই সন্তুষ্ট থাকতে হল।

তৃতীয়দিন রাত্রে ফেরার বিমান ধরার আগে প্রথমে যাওয়া হল 'শ্যনব্রউন' প্রাসাদ। প্রাসাদের বাগানে ঢুকলে মনে হবে হ্যাঁ, 'হাবসবুর্গ' বংশের রাজামশাইরা করেছিলেন বটে বাগান একখানা! ছয় শতক ধরে তাঁরা ছিলেন ইউরোপের শাসক। গরমকালে এসে থাকার জন্যে বাগানের সঙ্গে পেল্লায় প্রাসাদখানাও তাঁরা হাঁকিয়েছিলেন জব্বর।

'শ্যনব্রউন' অর্থে 'সুন্দর বসন্ত', বারোক স্থাপত্য-অনুসারী এই প্রাসাদের বর্তমান চেহারাটা তৈরি হয় সতেরোশো-চল্লিশ খ্রিস্টাব্দে, মহারানি মারিয়া থেরেসার আমলে। যেটুকু জায়গার ওপর এই বাগানখানা দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে নয়-নয় করে প্রায় শ-দুয়েক প্রমাণ সাইজের ফুটবল মাঠ এঁটে যাবে। বাগান ঘুরে দেখতে টিকিট লাগেনা, সেটুকু নিখরচায়। কেয়ারিকরা ফরাসি বাগানের একদিকে প্রাসাদ, সেদিকে দাঁড়ালে প্রায় দেড় কিমি দূরে অন্যপ্রান্তে দেখা যাবে 'নেপচুন ফাউন্টেন', তার ওপর 'গ্লোরিয়েট' বা 'লিটল হাউস'।

ঝকঝকে লন, পরিষ্কার রাস্তা, এমনকি গাছের নিচের বেঞ্চিগুলোর ওপরেও একফোঁটা ময়লা পড়ে নেই। সাহেব কোচোয়ান দর্শনার্থীদের জুড়িগাড়িতে চড়িয়ে বাগান ঘুরিয়ে দেখাচ্ছেন। সারা পৃথিবী থেকে বছরে প্রায় আটত্রিশলক্ষ লোক আসেন এই প্রাসাদ দেখতে। এই বিশাল এস্টেট আর তার এলাহি ব্যাপারস্যাপার পরিচালনা করার জন্য রয়েছে একটা আস্ত কোম্পানি। বেশি নয়, মোটে সাড়ে-চোদ্দশটা ঘর আছে এই প্রাসাদে, তার মধ্যে মাত্র বাইশটা ঘর ঘুরে দেখতেই পয়সা লাগে পনেরো ইউরো। এটাই ন্যূনতম মূল্য, আরো বেশি দেখতে হলে খরচাও বেশি।

শ্যনব্রউন প্রাসাদের বাগানে ঘণ্টা-খানেক ঘোরাঘুরি করার পরে ভিয়েনায় আমাদের সর্বশেষ গন্তব্য ছিল 'ন্যাসমারকেট'। ষোড়শ শতকে উইয়েন নদীর ওপরে তৈরি হয়েছিল এই বাজার, তখন এখানে শুধু দুধ আর দুগ্ধজাত জিনিস বিক্রি হত। শ্যনব্রউন থেকে মেট্রো চড়ে ন্যাসমারকেট, আর ভিয়েনায় মেট্রো বা ইউ-বানে চড়া মানে 'গভীরে যাও, আরও গভীরে যাও'-এর গল্প। এক এক সময় মাটির নিচে নামতে নামতে মনে হচ্ছিল প্রায় পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে পৌঁছে যাচ্ছি। ইউ-ফোর মেট্রোয় চড়ে নির্দিষ্ট স্টেশনে নেমে ভূগর্ভ থেকে ওপরে উঠে দেখি প্রায় দেড় কিলোমিটার লম্বা সে এক বিশাল বাজার, শতাধিক দোকান, সেখান এখন সত্যি বলতে কী দুধ বিক্রি হতে দেখা গেল না, তবে অন্য অনেক কিছুরই কেনাকাটা চলছে। ফল-মূল, শাক-সবজি, তরিতরকারি, মাছ-মাংস, স্থানীয় ওয়াইন আর চকোলেট, নানারকমের মশলা, মধু, সুগন্ধী তেল, স্যুভেনির এমনকি হলদিরামের চানাচুর পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে সেখানে, দাম দুই ইউরো। নামে বাজার হলেও হৈ-হট্টগোল নেই, ক্রেতাদের ধাক্কাধাক্কি নেই, জলকাদায় পিছল হয়ে থাকা মাছের বাজার নেই। অনেকেই ট্যুরিস্ট, কিছু স্থানীয় মানুষও

দিচ্ছেন চেখে দেখার জন্য। খুব বিক্রি হচ্ছে চিজের পুরভরা নানা রঙের লম্বা লম্বা লঙ্কা বা প্যাপরিকা, সেগুলো খেতে যাকে বলে 'ব্যাপক'। রেস্তোরাঁগুলোতে বেশ ভিড় - তুর্কি, গ্রিক, লেবানিজ, থাই ইত্যাদি নানান খাবারের দোকান। আড্ডা দেওয়ার জায়গাকে 'ঠেক' বলাটা বাংলায় এখন বেশ চালু, ওখানে দেখলাম ওয়াইন-এর দোকানের নাম 'ওয়াইনোঠেক'।

কেনাকাটা করার বিশেষ ইচ্ছে ছিলনা, ঘুরে ঘুরে শুধু উইনডো-শপিং করে, আর হরেককিসিমের জিনিসপত্র দেখতে দেখতেই পেটে খিদে চাগাড় দিয়ে উঠল। খিদের আর দোষ কী, সকালে শ্যনব্রউন দেখতে গিয়ে প্রায় মাইলখানেক হাঁটাহাঁটি করতে হয়েছে, আর এখন এই ন্যাসমারকেটের এমাথা থেকে ওমাথা একবার আপ-ডাউন করলেই দুই মাইল হাঁটা হয়ে যায়। বাজারে খাওয়ার জায়গার অভাব নেই, তার মধ্যে থেকেই একটা মধ্যপ্রাচ্যীয় রেস্তোরাঁ বেছে নেওয়া হলো। এসব জায়গায় আমিষ আহার্য বলতে প্রধানত বিফ আর পর্ক, সে আমার চলবেনা। অতএব তার বাবার নিরামিষ আহার্যের জন্য মেয়ে বেছে দিল 'বাবাগানুস' আর পিটা ব্রেড। আরবি ভাষায় 'বাবা' আর বাংলাতে বাবা একই ব্যাপার, যদিও গানুসের সঙ্গে গণেশের কোনও সম্পর্ক নেই। আজ অনেকদিন বাদে এই লেখাটা লিখতে গিয়ে দেখলাম, 'বাবাগানুস' কথাটার অন্য একটা মানে হল 'দি স্পয়েলড ওল্ড ড্যাডি'!

জিনিসটা আসলে মিহি করে বাটা বেগুনপোড়া, সঙ্গে থাকে তিল থেকে তৈরি 'তাহিনি', অলিভ অয়েল, লেবুর রস আর মসলা। নীল বর্ডার দেওয়া কানাউঁচু সাদা কলাই-করা বাটি চড়ে 'বাবাগানুস' এলেন, পিটা ব্রেড দিয়ে খেতে দারুণ লাগল। এই রকম কলাই-করা থালা, বাটি আর মগ ছোটবেলায় বাড়িতে ব্যবহার করা হতে দেখেছি, এখন বোধহয় হসপিটাল ছাড়া অন্য কোথাও আর কলাই করা জিনিস ব্যবহার করা হয়না। ভিয়েনার খানদানি কফি-হাউসগুলোর একটাও দেখা হয়নি, আজ তাই এক কাপ কফিও নেওয়া হল 'বাবাগানুস'-এর সঙ্গে। এখানে কফির সঙ্গে ছোট একটা গ্লাসে জল দেওয়ার রেওয়াজ আছে, জল দিয়ে জিভটা পরিষ্কার করে তবেই কফির কাপে চুমুক দিতে হয়, যাতে কফির স্বাদটা পুরোমাত্রায় পাওয়া যায়। এই বাজার দেখা আর খাওয়া-দাওয়ার পালা শেষ হওয়ার সাথেসাথেই ভিয়েনা ভ্রমণের পালাও সাঙ্গ হল। ভাবগম্ভীর আভিজাত্যে ভরপুর ভিয়েনাকে ছেড়ে এবার স্টুটগার্টে মেয়ে-জামাইয়ের ডেরায় প্রত্যাবর্তন।

~ *ভিয়েনার আরও ছবি* ~

আই.আই.টি. খড়গপুরের প্রাক্তনী কণাদ চৌধুরীর পড়াশোনা এরোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে। পরবর্তী সময়ে কর্মজীবন কেটেছে ভারতের একটি রাষ্ট্রায়ত্ত বিমান সংস্থায়। অবসরজীবন কাটছে বেহালা বাজিয়ে,নানান ধরণের গানবাজনা শুনে,বই পড়ে,ফেসবুকে টুকটাক লিখে এবং সুযোগ পেলে একটুআধটু বেড়িয়ে। ভ্রমণ সংক্রান্ত লেখালেখির জগতে প্রথম পদক্ষেপ 'আমাদের ছুটি'র আঙিনাতেই।

Comments

Name

Enter your comment here

Comment | Add Image

Not using Html Comment Box yet?

Anonymous · May 27, 2021 1

কণাদ মিত্র মহাশয়ের ভ্রমণকাহিনী পড়ে ভালো লাগলো। বাহুল্য বর্জিত ঝরঝরে ভাষা ওঁর। ভাষায় আধুনিকতা দেখাবার লোভে উনি নিজের স্বভাবকে লঙ্ঘন করেন না - এইটা দেখে আরও ভালো লাগলো।

Like · Reply · Flag

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011-19 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

ভাঙা মন্দিরের দেশ কাম্বোডিয়া

মলয় সরকার

~ পূর্বপ্রকাশিতের পর ~

চললাম বায়োন মন্দির দেখতে। সবুজ গাছের ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পিচঢালা প্রায় ফাঁকা রাস্তা দিয়ে টুকটুক চলেছে। এদিকে বোধহয় ট্যুরিস্ট ছাড়া কেউ আসে না। আর এসময়টা খুব বেশি ট্যুরিস্টের ভিড়ও হয় না। কাজেই রাস্তায় দু-একটা ট্যুরিস্টের টুকটুক ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না। আসল আংকোর থোম-এর চৌহদ্দির মধ্যে দক্ষিণদ্বার দিয়ে ঢুকলাম। মন্দিরনগরে এরকম কয়েকটি দ্বার আছে। প্রাচীনকালের তৈরি ভারী ভারী পাথরের। আর সর্বত্র হয় হাতির বা ওই সমুদ্রমন্থনের মূর্তি। এসে পৌঁছালাম বায়োন মন্দিরে।

বায়োন মন্দিরটি একেবারে সেন্ট্রাল আংকোর থোমে। এটিও বেশ বড়। এখন কাম্বোডিয়া দর্শনের অসময় হওয়ায় আমরা সৌভাগ্যবান, কোথাও ভিড় পেতে হয়নি। এই মন্দিরটি আসলে অনেক মন্দিরের সমাহার। একই চত্বরে বেশ কতগুলি মন্দির আছে। এটি কিন্তু বিষ্ণুর নয়, শিবের মন্দির। অর্থাৎ দ্বিতীয় সূর্যবর্মণের আগে এখানের রাজারা শৈব ছিলেন। মন্দিরে একটি বড় চূড়া, অন্যগুলি সেটিকে ঘিরে। সব চূড়াতেই বিশাল শিবের মুখ, চারদিকে চারটি এবং মাথায় একটি গোল চক্র। শিবের মুখগুলি, যেখানে যত মুখ আছে (পরে অন্যান্য মন্দিরেও দেখেছি, একেবারে একইরকম মুখ) স্মিতহাস, স্নিগ্ধ সৌম্যভাবের নিমীলিত নয়নের মূর্তি।

মূর্তিগুলি, দেখেই বোঝা যায়, বড় বড় পাথরের খণ্ড জুড়ে করা। অত ভারী ভারী পাথর টুকরো টুকরো অবস্থায় জুড়ে কী করে অত ওপরে তোলা হয়েছিল, নাকি ওপরে তুলে জোড়া হয়েছিল তা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। আজও তা এত ঝড়ঝঞ্ঝা সয়েও দাঁড়িয়ে আছে! তবে ঠিকমত যত্ন না হওয়ার ফলে এবং বোধহয় বেলেপাথরের কারণে মন্দিরগাত্র সবুজ মসে ভর্তি, যা মন্দিরের ক্ষয়কে দ্রুততর করছে। প্রধান দরজা পেরোলেই একটি উপবিষ্ট বুদ্ধের মূর্তি আছে,যা সম্ভবত পরিবর্তিত শিবমূর্তি। দেওয়ালের খোদাই কাজগুলি দেখার মত। একটি কাজ দেখে মনে হল নটরাজের মূর্তি, সেই একই মুদ্রা, একই ঢং। এখানে আমরা পরিষ্কার একটি শিবলিঙ্গ দেখেছি, যোনিপটের উপরে। এছাড়া অনেক উৎপাটিত শিবলিঙ্গের গর্ত দেখেছি।

চূড়ার ওই বড় বড় মুখগুলো শিবের কিনা এ নিয়ে অবশ্য মতভেদ আছে। কেউ বলেন ওগুলো রাজা দ্বিতীয় সূর্যবর্মণের, কেউ বলেন বোধিসত্ত্বের। এখানেও সেই একই ব্যাপার, অর্থাৎ বেশ উঁচু প্ল্যাটফর্মের ওপরে মন্দির এবং সেই খাড়াই উঁচু সিঁড়ি। ফলে এখানেও আলাদা কাঠের সিঁড়ির ব্যবস্থা করতে হয়েছে। তবে এখানে যে সমস্ত মন্দির রয়েছে সেগুলো মনে হল ঠিক গোছানো নয়। মন্দিরে ঢোকার মুখেই সিংহের মূর্তি হিন্দুত্বকেই প্রকাশ করে। কী করে আজকের বিজ্ঞানের সাহায্য ছাড়া সেকালের মানুষেরা এই সমস্ত কাজ করেছিলেন কে জানে! অথচ আজকের বিজ্ঞানের এত উন্নতি সত্ত্বেও টাইটানিকও ডোবে আর বড় বড় সেতুও ভাঙে। তাহলে কী আমরা সত্যি বিজ্ঞানে এগিয়েছি না পিছিয়েছি সেই প্রশ্নই মাথায় ঘুরতে থাকে।

আংকোর থোম শহরে বা তার আশেপাশে অজস্র মন্দির - সব দেখা বোধ হয় কারোর পক্ষেই সম্ভব নয়। দেখতে দেখতে একঘেয়েমি এসে যাওয়াও বিচিত্র নয়। আমাদের গ্রামের পুরনো শিব মন্দিরের মত পরিত্যক্ত, ছড়ানোছিটানো জঙ্গলে ঢাকা ছোটখাটো মন্দিরও অনেক আছে। কাজেই প্রধান প্রধান মন্দিরগুলো দেখারই পরিকল্পনা নিলাম। শান্তশিষ্ট জায়গায় পরিষ্কার পিচঢালা রাস্তায় টুকটুক চেপে ঘন সবুজের মাঝ দিয়ে অল্প রোদে পিঠ দিয়ে হাওয়া খেতে খেতে যেতে ভালোই লাগছিল।

রাস্তার ধারে নানা জায়গায় গাছের সঙ্গে বাঁধা বা লোহার স্ট্যান্ডে ঝোলানো দড়ির লম্বা দোলনায় কেউ কেউ শুয়ে বসে আছে। এরা যাযাবর নাকি দোলনাগুলো বিক্রির জন্য এনেছে ঠিক বুঝলাম না। টুকটুকওয়ালা ছেলেটির এমনিতে ব্যবহার ভাল কিন্তু এতটাই কম কথা বলে এবং ইংরেজি কম বোঝে যে তার কাছ থেকে যে বিশেষ কিছু জেনে নেব তা আর সম্ভব হচ্ছে না। বেশ কয়েকবার ভাব জমাতে চেষ্টা করলাম কিন্তু তা মাঠে মারা গেল।

বায়োন মন্দিরকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেলাম। যেতে যেতে দেখলাম 'বিজয় দরজা' বা ভিকট্রি গেট। খমের রাজ কোনো যুদ্ধ জয় করে এই দ্বার তৈরি করেছিলেন। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে ৩ কিমি করে বর্গাকার আংকোর থোম শহরে প্রবেশের মোট পাঁচটি প্রধান দরজা আছে। বায়োন মন্দিরকে ঠিক মাঝখানে রেখে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ চারদিকে চারটি ছাড়াও পূর্ব দিকে আছে আরো একটি। সেটি এই বিজয় দরজা। প্রত্যেকটি দরজাই মন্দিরের ঢংয়ে নির্মিত। বিশাল একটি শিবের (মতান্তরে বুদ্ধের) মুখসহ বেশ কয়েকটি হাতির মাথা আর পদ্মফুল এবং কয়েকটি চূড়াসহ বিরাটাকার পাথরের গেটগুলি প্রাচীনত্বের ছাপ নিয়ে আজও স্বমহিমায় বর্তমান ।

পৌঁছলাম আংকোর থোমের ঠিক বাইরে টা কেও মন্দিরে। মন্দিরে ঢোকার মুখেই ঘাবড়ে গেলাম, প্রবেশদ্বারের মাথায় যে পাথর তাতেই একটা ঠেকা দেওয়া আছে। ভয় লাগছিল, ভেঙে পড়বে না তো! গোটা গেটটাই লোহার ঠেকা দিয়ে রাখা আছে। মনে হচ্ছে যে কোনো মুহূর্তে সব হুড়মুড়িয়ে পড়ে যাবে। যাই হোক ঢোকা তো গেল। এখানেও সেই গেটের মাথায় একই স্মিতহাস্য প্রকাণ্ড মুখ।

ঢুকতে পারবে না। সাপের মাথাওয়ালা রেলিং দিয়ে ঘেরা বাঁধানো পরিষ্কার রাস্তা দিয়ে এগোনো গেল। সব মন্দিরই বেশ পুরনো তবে পথঘাট-মেঝে একেবারে পরিচ্ছন্ন। বিশাল বিশাল গাছ আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে মন্দিরটাকে। বেশি ভিতরে ঢোকা গেল না। সরকারি নোটিসও রয়েছে ঢুকতে মানা করে। মন্দিরের পাথরের দেওয়ালগুলো প্রচুর অপ্সরী নিয়ে এমন অবস্থায় আছে যে, যে কোনও মুহূর্তে পড়ে যেতে পারে। মন্দিরগাত্রে গজিয়ে ওঠা গাছগুলি এতই বড় হয়ে গেছে যে তাদের হাত থেকে মন্দিরকে উদ্ধারের বিশেষ চেষ্টাও করা হয় নি। বোধহয় সেটা আর সম্ভবও নয়। আমার তো মনে হল পঞ্চাশ-ষাট বছর বাদে সম্পূর্ণই ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। মনটা অদ্ভুত রকমের খারাপ হয়ে গেল।

বিশালাকায় এই স্থাপত্য একটি অসমাপ্ত শিবের মন্দির। এটি রাজা পঞ্চম জয়বর্মণ-এর রাজকীয় মন্দির ছিল। মন্দিরের কাজ অসমাপ্ত রেখে দেওয়ার সঠিক কারণ জানা যায় না। তবে এটি বহুদিন নানা সংস্কৃতির পীঠস্থান ছিল । এর চারধারে করিডরগুলি দেখার মতো। যদি সম্পূর্ণ হত তবে এটি আংকোর থোমের একটি অপরূপ অলংকার হত। এরও মাথায় মেরু পর্বতের অনুকরণে পাঁচটি চূড়া আছে।

বেরিয়ে আবার টুকটুকের সওয়ারি হলাম। সে আমাদের নিয়ে ছুটল পরের মন্দির দেখাতে। সেটির নাম টা প্রম। বেশি দূরে নয়, কাছেই।

টা প্রম মন্দিরটি ১৯৯২তে ইউনেস্কোর হেরিটেজ তালিকাভুক্ত পেয়েছে। ঢোকার মুখেই দেখি বড় বোর্ড লাগানো আছে যে ভারতের আর্কিওলোজিক্যাল সোসাইটি ও কাম্বোডিয়া সরকারের যৌথ প্রচেষ্টায় এখানে সংস্কারের কাজ চলছে। এটি সপ্তম জয়বর্মন দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তৈরি করেছিলেন মহাযান বুদ্ধ মন্দির ও বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে। মন্দিরটির বিশেষত্ব এই যে মূল অংশটি বৃক্ষের করালগ্রাসে এবং সেটি সেইভাবেই দর্শনীয় হয়ে আছে। দর্শনার্থীরা মন্দিরটিকে এইরকম বৃক্ষপরিবেষ্টিত বা শিকড়পরিবেষ্টিতরূপে দেখার জন্যই আসেন। হাঙর বা কুমির কোনো প্রিয়জনকে আক্রমণ করেছে এবং

গেলে এখন যেটুকু দেখা যাচ্ছে তাও ধ্বংস হয়ে যাবে। উদ্ধারকারীর দল মন্দিরকে গাছের আগ্রাসন থেকে মুক্ত করার চেষ্টাও করেননি। গাছগুলি ঠিক বট বা অশ্বত্থ নয়, তবে ওই জাতীয়, গাছের গায়ে নাম লেখা দেখলাম 'ছম্বক'। বিশাল অজগর সাপের মত শিকড়ের চেহারা সত্যিই বিস্ময় জাগায়। মনে হল সভ্যতার অগ্রগতির পাশাপাশি বনরাজিকে নির্মূল করে মানুষ বসতি স্থাপন করেছে। আবার সুযোগ পেলেই যে প্রকৃতি মানবসভ্যতাকে ধূলোয় মিশিয়ে দিয়ে আপন অস্তিত্বকে যে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনবে এটাই তার প্রমাণ। বোধহয় এই অবস্থাকে প্রত্যক্ষ করার জন্যই অন্যান্য মন্দিরের তুলনায় বেশি ভিড় এখানে। চতুর্দিকে ছড়িয়েছিটিয়ে আছে প্রচুর পাথরের স্তুপ, যা এককালে মন্দিরের শোভাবর্ধন করেছিল।

যতদূর জানা যায় মন্দিরটি রাজা জয়বর্ধনের মাকে উৎসর্গ করা হয়েছিল। এককালে আশিহাজার মানুষের আশ্রয়স্থল ছিল এই মন্দির। প্রচুর করিডোর বা বারান্দা আছে, যেগুলি এখন প্রায় দুর্ভেদ্য এবং অপ্রবেশ্য। নানা বিদেশি সিনেমার শুটিংও হয়েছে এখানে। চতুর্দিকে গাছের পাতায় ঢাকা এই বিশাল মন্দিরে যেন এক দুঃখের সবুজ ছায়া একটা ভিজে ভিজে অশ্রুমাখা আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছে। ঝোপঝাড়ের জঙ্গলটুকু সরিয়ে মন্দিরটিকে দর্শনীয় করে রাখা হয়েছে। এখানকার বড় গাছগুলিকে আর সরানো সম্ভবও নয়। মন্দিরের এক-এক টনেরও বেশি ওজনের পাথরের একটিও যদি পড়ে যায়, যে কোনো মুহূর্তে এক মারাত্মক কাণ্ড ঘটে যাবে।

মন্দিরের অদূরেই এক দিঘি, পাথর দিয়ে বাঁধানো স্নানের ঘাট। রাজকীয় স্নানের এই দিঘির নাম শ্রা শ্রাং। প্রায় ৭০০ মি লম্বা আর ৩৫০ মি চওড়া বিরাট দিঘিটির মাঝে একটি দ্বীপ। এটি দশম শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছিল। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় বেশ সুন্দর দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। এখানে এসে মন কিছুটা তৃপ্ত হল। মন্দির দেখতে দেখতে খানিক ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলাম। বিশেষ কিছু দ্রষ্টব্য না থাকলেও বসলাম দিঘির কাকচক্ষু শান্ত জলের দিকে তাকিয়ে সেই যুগটাকে মনে করে নিজেকে একটু চাঙ্গা করে নিতে। বাঁধানো পাড়ে বসে মানসচক্ষে দেখছিলাম রাজা-রানিদের জলকেলির দৃশ্য আর মাঝে মাঝেই হারিয়ে ফেলছিলাম নিজেকে। এর কাছেই পাওয়া গেছে বেশ কিছু পারলৌকিক ক্রিয়ার কলস ও তাদের অবশিষ্টাংশ এবং একটি

উলটোদিকেই আছে বান্তে কদেই। দৌড়লাম সেখানে। পাহারাদার বড় কড়া। বলল, সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে, আজকে আর ঢোকা যাবে না। সত্যি কখন যে সময় চলে গেছে বুঝতেই পারিনি। তবু তার হাতে ধরে বললাম, এখনও তো বন্ধ হতে দশ পনের মিনিট বাকী, একটু গিয়েই চলে আসব। কী যেন ভাবল। বুঝলাম ঈশ্বর সহায়। বরফ গলল। বলল, যান তাড়াতাড়ি ফিরে আসবেন।

দৌড়লাম। এখানেও মন্দিরের ঢোকার মুখে সেই বিশাল মুখসহ দরজা। বেশ কিছুটা গাছে ঢাকা মোরামের রাস্তায় যাওয়ার পর একইরকম বিশাল পুরানো ধ্বংসপ্রায় মন্দির। তবে একটা জিনিস বারংবার লক্ষ্যণীয়, যেখানে ভাঙ্গাচোরা যাই থাক মন্দিরের সবকিছু একেবারে পরিচ্ছন্ন। কোথাও এতটুকু আবর্জনা নেই যা দেখে গা ঘিন ঘিন করবে। এত পুরোনো সব স্থাপত্য ভগ্নপ্রায় হয়ে গিয়েও সারা বিশ্বের পর্যটককে আকর্ষণ করছে বোধহয় এইজন্যই। আর আমাদের দেশে অজস্র দ্রষ্টব্য থাকা সত্ত্বেও ভ্রমণপিপাসুদের বড় অংশই সেদেশে আসেন না।

বায়োন মন্দিরের ঢঙে দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্মিত বান্তে কদেই একটি বৌদ্ধ মন্দির। সম্ভবতঃ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের আবাস ছিল এটি। বেশ কিছু পাথরের সিংহ আজও এই স্থাপত্য পাহারা দিয়ে চলেছে। নিম্নমানের পাথর দিয়ে তৈরি বলে দ্রুত নষ্ট হয়ে আসছে। তবে এটি অপেক্ষাকৃত ছোট এবং বর্তমানে সংরক্ষণের কাজও চলছে।
সেই খালটির পথে ফিরলাম যার ওপর দিয়ে একসময় এই মন্দিরগুলি নির্মাণের পাথর বয়ে আনা হয়েছিল। খালের ধার বরাবর গাছ বা বসার জায়গা আছে অনেক জায়গাতেই। পারাপারের ছোট ছোট ব্রিজগুলিও বেশ সুদৃশ্য। শহরের এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত চলে গেছে এই খাল।
হোটেলে ফিরলাম। টুকটুকওয়ালা ছেলেটি বিদায় নিয়ে জানালো আবার কাল আসবে।

বিশ্রাম নিলাম খানিকক্ষণ। গতকাল কুলেন রেস্তোরাঁ থেকে ফেরার সময় দেখে এসেছিলাম পাশেই একটা রাস্তা আছে যেটা রাতকে প্রায় দিন করে ফেলেছে। তার নাম পাব স্ট্রিট। সেখানে ঝিং ঝ্যাং বিদেশি গান, নাচ আর পানীয়ের হুল্লোড়। প্রচুর ঠেলাগাড়িতে বিভিন্ন ধরণের আইসক্রিমের সম্ভার, ঠাণ্ডা পানীয়। খানাপিনার সঙ্গে রংবেরঙের আলোকসজ্জায় গোটা রাস্তাটাই যেন লাস্যময়ী হয়ে উঠেছে। নিউইয়র্ক-এর টাইম স্কোয়ারের কথা খুব মনে পড়ছিল। সারাদিন আংকোরভাটের ঘোরাঘুরির শ্রান্তির পর একটু মনের ক্লান্তি ঝরাতে পাবের, রেস্তোরাঁর কাম্বোডিয়ার সুন্দরীরাও ভীষণ তৎপর। স্পেশাল খমের ডিসের সঙ্গে বেশ সস্তা ঠাণ্ডা বিয়ার আর ককটেলে মনটাকে ভিজিয়ে একটু নেচে নিয়ে নিজেকে একটু আনন্দ দেওয়াই যায়। ঢুকলাম একটা নামী রেস্তোরাঁ, পেপার টাইগার ইটারি-তে। এখানকার সাজসজ্জা আর ট্রাডিশনাল খমের খাবারে মনোনিবেশ করলাম। বেশ ভাল লাগল রেস্তোরাঁটি, খাবারের দামও বিশাল কিছু নয়। সুন্দরীরা খাবার দিয়ে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই। এখানে নাচ-গানের ব্যবস্থা নেই তবে খমের খাবারের জন্য দোকানটি বিখ্যাত। শুকনো মাছ, শুকরের মাংস, নুডল খুব পছন্দের এখানের লোকজনের। ভাতও খায় তবে চালটা একটু আলাদা। মাছ এবং নারকেল দুধে তৈরি আমোক আর শুকরের মাংসভাজা লোক লাক এদের বিশেষ খাবার। নাম বান চোক বা খমের নুডল এক বিশেষ কাম্বোডিয়ান নুডল (এটার তৈরির পদ্ধতি পরে দেখেছিলাম), খেতে চমৎকার। নুডল সুপও বেশ ভালো। শুধু এই দোকান নয়, গোটা পাব স্ট্রিটটাই বেশ পরিচ্ছন্ন। নৈশবিনোদন শেষ হবে ভোর চারটেয়। পাশেই আছে নাইট মার্কেট। আমরা আর সেখানে যাইনি। তার বদলে হোটেল থেকে বেরিয়ে একটা কার্ট থেকে খেলাম ফ্রায়েড আইসক্রিম। নাম শুনে প্রথমে চমকে উঠেছিলাম। আইসক্রিম আবার ফ্রায়েড হয় কী করে? দেখে বেশ লাগল – তাওয়ার মত একটা পাত্রের উপরে দুধ আর ফলের কুচি দিয়ে নিপুণ এবং দক্ষ হাতে সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হচ্ছে এই আইসক্রিম। বেশ লাগল খেতে। কয়েকটি দোকানে কাচের বেশ বড় গামলায় ছোট ছোট মাছ ঘোরাঘুরি করছে। আর সেই পাত্রের জলে পা ডুবিয়ে বসে আছে দেশি-বিদেশি সুন্দরীরা। সকলের মুখে এক গা শিরশিরানি আনন্দের সুড়সুড়ির অভিব্যক্তি। কী ব্যাপার, কাছে গিয়ে দেখি, জলে ডোবানো পায়ের চেটোর চারপাশে মাছেরা ঠোকর দিচ্ছে। এই মাছগুলো নাকি চর্মভুক। পায়ের থেকে মরা চামড়া ঠুকরে খেয়ে নেয় এবং তার ফলে পা নাকি মসৃণ এবং সুন্দর হবে। এই ব্যবস্থা কয়েক বছর আগে তুরস্কে দেখেছিলাম। ভারতেও হয়তো আছে, তবে আমি কোথাও দেখিনি। রূপচর্চার কতরকমেরই কায়দা – দেখে আশ্চর্য হই।

এত রাতেও প্রচুর টুকটুক দাঁড়িয়ে আছে। তবে সওয়ারির তুলনায় গাড়ির সংখ্যা অনেক বেশি বলেই বোধ হল, যেমনটি আজকাল আমাদের এখানেও প্রচুর ই-রিক্সা হয়ে গেছে।
পরদিন সকালে স্নান সেরে আবার ঠিক সাড়ে আটটায় নীচে নেমে দেখি হোটেলের সামনে হাজির আমাদের গতকালের সারথি। তাকে একটু অপেক্ষা করতে বলে তাড়াতাড়ি প্রাতঃরাশ সারি। ভেবেছিলাম স্থানীয় কিছু খাব - কিন্তু হোটেলে গতানুগতিক কন্টিনেন্টাল ব্রেকফাস্ট ছাড়া আর কিছু রাখে না। ওগুলো খেয়ে খেয়ে মুখে অরুচি ধরে গেছে। অগত্যা কী আর করা। বাড়ি থেকে যাওয়ার সময় বেশ কয়েকটা মশলা দেওয়া পুরভরা পরোটা নিয়ে গিয়েছিলাম। গতকালও তাই দিয়ে দুপুরের খাওয়া সেরেছিলাম। যা আছে আজও হয়ে যাবে । অতএব ও ব্যাপারে নিশ্চিন্ত। খেয়েদেয়ে সওয়ার হলাম টুকটুকের। গাড়ি ছুটল সেই আগের রাস্তাতেই লোকালয় ছাড়িয়ে, খাল পেরিয়ে, বাজার ছাড়িয়ে। মনে হল যেন ছুটেছে মনপবনের নাও। সবুজের বন্যার মধ্যে দিয়ে ভেসে চলেছি আধো রোদ আধো ছায়াঘেরা ফাঁকা রাস্তায়, দু-একটি টুকটুক ছাড়া আর কিছু চলাচল করছে না। পাশে পড়ে রইল বিশাল দেহ আর সুউচ্চ চূড়া নিয়ে আংকোরভাট। আমাদের যাচ্ছি আংকোর থোমের ছোট বৃত্ত ছাড়িয়ে বড় বৃত্তের দিকে। সাউথ গেট ছাড়িয়ে বায়োন মন্দির পাশে রেখে উত্তরদ্বার দিয়ে বেরিয়ে পৌঁছলাম প্রিয়া খান-এ। নামিয়ে দিয়ে চালক বললেন, আপনারা এই গেট দিয়ে ঢুকে ওপাশের গেট দিয়ে বেরোবেন। আমি ওখানে থাকব।

প্রবেশদ্বারে কালকের সেই টিকিট দেখিয়ে এগোনো গেল। গেট থেকে মূল মন্দির বেশ কিছুটা দূরে। গাছেঢাকা রাস্তার পাশে কয়েকজন প্রতিবন্ধী মানুষ এক অদ্ভুত বাজনার সুর তুলেছে কিছু রোজগারের আশায়। দু-একজন হস্তশিল্পের পশরা সাজিয়ে বসেছে। তবে দাম আর জিনিসের মানে পোষালো না। এগিয়ে চললাম মন্দিরের দিকে। মন্দিরের ঢোকা এবং বেরোনোর মুখে সেই দেব-অসুরের বাসুকীকে ধরে টানাটানির মূর্তি – কিন্তু ধর্মীয় লড়াইতে সবাই কবন্ধ। অর্থাৎ মানুষের লড়াইয়ের ফলে দেব-দানব এক হয়ে গেছে! মন্দিরের দরজার দুপাশে দুই দ্বারপাল মুণ্ডহীন অবস্থাতেও তাদের কর্তব্যে অবিচল থেকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। চত্তুরে অন্যান্য মন্দিরের মতই অনেকগুলো ছোট ছোট মন্দির, বারান্দা, দেওয়াল জুড়ে নানা মূর্তি, কোথাও ক্ষতবিক্ষত, কোথাওবা অবিকৃত। বৌদ্ধ এবং শৈবের মিলনক্ষেত্র দেখলাম এখানে, যেটা আগে ঠিক কোথাও এইভাবে দেখিনি।

বেশ কিছু যোনিপট দেখলাম, শিবলিঙ্গ তুলে নেওয়া হয়েছে। একটি অক্ষত শিবলিঙ্গও দেখা গেল। আবার এক জায়গায় একটি বৌদ্ধ স্তুপও দেখলাম, ওপরটা খোলা রাখা হয়েছে যাতে আলো আসতে পারে। আলো-আঁধারির জাদুতে রহস্যময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। রহস্য চিত্রনাট্যের সিনেমার শ্যুটিং করার জন্য আদর্শ জায়গা।

শুনলাম সংস্কারের কাজ কিছুটা করার পর পরিত্যক্ত হয়েছে। সেই একই দৃশ্য – চতুর্দিকে ভাঙাচোরা ছড়ানোছিটানো বিপুলাকৃতি পাথরের স্তুপ - প্রতিটার গায়েই বয়ে আনার সময়ের দু-তিনটি ফুটো রয়েছে। একটা জায়গায় বেশ একটা উঁচু প্ল্যাটফর্মের ওপর দ্বিতল একটা গ্যালারি বা ওই ধরণের কোন হলের কাঠামো পড়ে রয়েছে।
জানা গেল এটিরও নির্মাণ দ্বাদশ শতাব্দীতে। একশো চল্লিশ একর জায়গা জুড়ে গড়ে ওঠা মন্দির এলাকায় বাহাত্তরটি নাগ হাতে ধরা গরুড়ের মূর্তি পাওয়া যায়। সপ্তম জয়বর্মণ তাঁর বাবার স্মৃতিতে এই মন্দির তৈরি করেন। এখানে প্রায় হাজারখানেক নর্তক-নর্তকী, এক হাজার শিক্ষক ও এক লক্ষ মানুষ থাকতেন। একাধারে নগর, মন্দির ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ করত এটি। এখানে বিষ্ণু, শিব, ব্রহ্মা এমনকী শ্রীকৃষ্ণের গিরিগোবর্ধন ধারণের ভাস্কর্যও পাওয়া যায়। ভিতরে প্রবেশ করলে মন্দির ধ্বংসের কাজে শিমুল গাছের কী অমিত বিক্রম তাও দেখা যায়। এককালে যেসব অঞ্চল গমগম করত মানুষের কাজের ভিড়ে আজ হা হা করা শূন্যতা বুকে নিয়ে পুরানো গৌরবের স্মৃতিকে আঁকড়ে বেঁচে আছে আর মৃত্যুর দিন গুনছে।

বেরিয়ে এলাম মন্দিরের অপরদিক দিয়ে। পাথরে বাঁধানো দীর্ঘ চত্বর পেরিয়ে তবে বেরোনোর রাস্তা। বেরোনোর আগে দেখে নিলাম বিশাল মহীরুহের, অজগরের মত, মন্দিরকে জড়িয়ে ধরে মরণপণ লড়াই। কী পরিমাণ দক্ষ ইঞ্জিনিয়ারিং, শিল্প, সৌন্দর্যবোধ, পরিশ্রম ও অর্থের সম্মিলিত রূপ এই মন্দির – ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। বাইরে এসে বসলাম ছোট্ট দোকানে। ডাব বিক্রি করছে। নিলাম এক ডলার করে তিনটে ডাব। তবে একসঙ্গে নেওয়ার জন্য নিল আড়াই ডলার। এখানেও যেমন জল, তেমন শাঁস - খেয়ে পেট একেবারে পুরো ভর্তি হয়ে গেল।
কিছু লোক নানারকমের হস্তশিল্পের নিদর্শন বিক্রি করছে, তবে সবাই বেশ গরীব শ্রেণীর। ইচ্ছা থাকলেও নেওয়ার মত কিছু পেলাম না। ইতিমধ্যে চোখ গেল উল্টোদিকে এক আদিগন্তবিস্তারী জলাশয়ের দিকে। দেখে খুব গভীর মনে হল না। মনে হল একটা নীচু জায়গার জমা জল। পাড়ে কিছু ছোট ছোট শালতি ধরণের নৌকা রয়েছে। বুঝলাম এটা অল্পদিনের নয়। জলের মাঝে মাঝে অনেক বড় বড় গাছও রয়েছে - কিছু মরা, শুকনো ডালপালা মেলে উদবাহু হয়ে নৃত্যভঙ্গিমায় আর কিছু

ও ৯০০ মিটার চওড়া। নীল আকাশের নীচে এই কৃত্রিম জলাধারটি বর্ষায় বেশ জলে ভরে ওঠে আবার কখনো কখনো প্রায় শুষ্ক হয়ে পড়ে। তবে এর সৌন্দর্যে মুগ্ধ না হয়ে পারলাম না ।

জলাশয়ের মাঝে একটি কৃত্রিম দ্বীপে আছে আর একটি ছোট মন্দির –নিক পিন। এটিও দ্বাদশ শতাব্দীতে রাজা সপ্তম জয়বর্মন তৈরি করান। প্রথমে বুদ্ধকে উৎসর্গ করে এটি নির্মিত হয় এবং পরে তা বোধিসত্ত্ব লোকেশ্বরকে উৎসর্গ করা হয়। প্রিয়া খান থেকে বেরিয়ে জলাশয়ের ধার ধরে কিছুটা এগোতেই এসে পৌঁছালাম একটি লম্বা সরু, পায়ে হাঁটার কাঠের ব্রিজের কাছে। ব্রিজটি জয়তাটাকা বারায়ের ওপর দিয়ে সোজা দ্বীপটিতে পৌঁছেছে। নীচ দিয়ে অগভীর জল বয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি দুজন যেতে পারবে না এমনই সরু ব্রিজ। নিক পিন মন্দিরটি ছোট এবং একটি ছোট পুকুরের মধ্যে রয়েছে। কাছে যাওয়া গেল না, পুকুরের পাড় থেকেই দেখতে হল। মন্দিরের চারদিকেই দরজা তবে বর্তমানে একটি দরজাই খোলা মনে হল। একটি পাথরের ওপর রয়েছে মন্দিরটি অবস্থিত, একটি বড় সাপ পাক দিয়ে রয়েছে পাথরটিকে। এছাড়া মন্দিরে অনেক সিংহ, ঘোড়া, হাতি ইত্যাদির মূর্তি দেখলাম। শিবলিঙ্গ আর যোনিপীঠো রয়েছে অনেকগুলি। বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্ম এখানে যেন সব গুলিয়ে যাচ্ছে। ফেরার সময় এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপ হল। সঙ্গে তাঁর স্বামীও ছিলেন। বললেন, ওঁরা প্যারিস থেকে এসেছেন। আমরা ভারতের, বিশেষ করে কলকাতার শুনে বললেন ওঁরাও এখন কলকাতা থেকে আসছেন। ওঁদের ছেলে জোকায় ম্যানেজমেন্ট ইন্সটিটিউটে পড়ে। তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। শুনে ভাল লাগল যে সুদূর ফ্রান্স থেকে কেউ কলকাতায় পড়তে এসেছে।

ফেরার পথে ব্রিজের মুখে দেখি অনেক জামাকাপড় বিক্রি হচ্ছে। মেয়ে দু-একটা নিল এখানকার স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে।

একটু এগোতেই পেলাম আর এক মন্দির, টা সোম। ঢোকার মুখে দেখি একটি বাচ্চা ছেলে মন্দিরের ছবি এঁকে চলেছে আপনমনে। হয়ত এই আশায় যে এটা বিক্রি করে কিছু পাবে। ভিখারি নেই কোথাও, নেই কোনো গাইডের উৎপাত। সবটাই পরিচ্ছন্ন শূন্য পরিত্যক্ত - এককালের গরিমামণ্ডিত বার্ধক্যের ভারে জর্জরিত। বেলেপাথরের মন্দিরটির দরজায় যেভাবে ঠেকা দেওয়া রয়েছে প্রতি মুহূর্তেই পড়ে যাবার ভয় লাগে। পূর্ব দরজাতে একটা বিশাল বৃক্ষদানব যেভাবে তার করাল গ্রাসে সমস্ত শিল্পসৌন্দর্য আত্মসাৎ করেছে তা রীতিমত ভয়ের উদ্রেক করে। যদিও এটা তুলনামূলক ভাবে ছোট, তবু বায়োনের ঢঙে রাজা বা বোধিসত্ত্বের মুখ মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সমস্ত মন্দিরটি যথেষ্ট সুন্দর। এখানেও উদ্ধারকার্য পরিত্যক্ত। এটিও দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রাজা সপ্তম জয়বর্মন তৈরি করান। সুদীর্ঘকাল জঙ্গলের গ্রাসে পড়ে থাকার পর ১৯৩০ সালে পুনরুদ্ধার করা হয়।

এরপর পৌঁছলাম ইস্ট মেবোন অঞ্চল ছাড়িয়ে প্রায় শ্রা শ্রাং দীঘির কাছাকাছি একটি পাঁচ চূড়া বা পাঁচটি আলাদা প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত এক চাতালের ওপর মন্দির নিয়ে প্রি রুপ মন্দিরে। ঢোকার মুখেই ধাক্কা খেলাম সিঁড়ি দেখে। সরকার ব্যবস্থা করেছেন, তবে আমার মত ভ্রমণপিপাসুদের কাছে সেও বড় কঠিন পরীক্ষা। সিঁড়িগুলো এমনই যে যেকোনো মুহূর্তে পড়ে গিয়ে বিদেশে হাসপাতালবাসী হওয়ার পক্ষে অতি প্রশস্ত রাস্তা। মন্দিরটি প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত। তবে এখানে মনে হল না খুব সূক্ষ্ম কাজ ছিল। উঁচু দেওয়ালের ওপর হাতি বা সিংহ একেবারে জীবন্ত। এখানেই দেখলাম পাথরের সঙ্গে পাতলা পোড়া ইটের ব্যবহার। পুরো মন্দিরটাই ইট দিয়ে তৈরি। বিশাল চাতাল বা মন্দিরের ইঞ্জিনিয়ারিং নকশা নিখুঁত। এই মন্দিরটি অপেক্ষাকৃত ভাবে পুরাতন - দশম শতাব্দীতে নির্মিত হয় মন্দির এবং এটি একটি হিন্দু মন্দির। তবে মনে করা হয় এটিও পারলৌকিক কাজেই ব্যবহৃত হত। চাতালে অবস্থিত চৌবাচ্চাটিও এই ধারণাকেই সমর্থন করে। এক সময় এখানে লক্ষ্মী, উমা, বিষ্ণু, শিব সবার মূর্তি ছিল। পশ্চিমের বিদায়ী সূর্য যখন রক্তাভ লাল আভার সিঁদুর ছড়িয়ে দিগন্তের সিঁথি লাল করে তার কোলে আশ্রয় নিতে যান, সেই লালিমা ছড়িয়ে পড়ে মন্দিরের আপাদমস্তক। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। মন্দিরগুলো লাল বেলে পাথরে তৈরি হওয়ায় সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত এখানে ছবি শিকারী আর সৌন্দর্যরসপিপাসুদের কাছে দুটি খুব মূল্যবান সময়।

ওপর থেকে দেখা যায় বহুদূর অবধি, নিশ্চিন্ত মনে রাখাল ঘুরে বেড়াচ্ছে বা তার চিকণ কালো ভঁইসের দল আরামে ঘাসে মুখ ডুবিয়ে রয়েছে। তখন একবারও মনে হয় না যে বিদেশে আছি। বরং আরও বেশি করে নিজের সেই শান্ত শ্যামল গ্রাম বাংলাকে মনে পড়ে।

টুকটুকওয়ালা বলল, বলুন এবার কোথায় যাবেন। বললাম, শুনেছি টোনলা স্যাপ বেশ ভালো, দেখার মত। সেখানে কি আজ যাওয়া যাবে? বলল, হ্যাঁ, তবে রাস্তা ২৫ মাইল, আমাকে এর জন্য আরও দশ ডলার বেশি দিতে হবে। বললাম, চলো। ভাবলাম, টোনলা স্যাপ তো একটা লেক, তাতে জলবিহার করার অত আগ্রহ নেই। তবে লেকের ধারে গিয়ে অবস্থাটা দেখে আসব।

গাড়ি ছুটল সিয়েম রিপের গ্রামের মধ্যে দিয়ে। কর্মসূত্রে দীর্ঘদিন ছিলাম আসামে, ঘুরেছি সেখানকার নানান গ্রামে। আমার মনে হল অনেকদিন পর যেন আবার আসামে এসেছি। এদের খাওয়াদাওয়া, ঢং, বেশবাস বিশেষ করে গ্রামের বাড়ি বা তার আশেপাশের পরিবেশ সবটাই যেন আসামের সঙ্গে অনেক মেলে। বাড়িগুলিও মাটি থেকে উঁচুতে কাঠের খুঁটির ওপর। তলাটা ফাঁকা – সেটা বন্যা থেকে বাঁচতে কী বন্য জন্তুর থেকে বাঁচতে তা জানিনা। অনেকে সেই ফাঁকা অংশে গ্যারেজ করেছে বা কোন ছোট মেসিন বসিয়েছে আবার কেউ ফাঁকাই রেখেছে। বাড়ির মেয়েরা কিছু গৃহসামগ্রী বা ফল সবজি এইসব টুকিটাকি নিয়ে বাড়ির সামনে ছোট দোকান করেছে। সব মিলিয়ে একটুকরো আসাম বলেই মনে হল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক এইভাবে চলার পর ড্রাইভার বলল, আর যাওয়া যাবে না। এখান থেকে টিকিট কাটতে হবে। ওর কথার মাথামুণ্ডু বুঝতে পারলাম না। বললাম, লেকটা কই? আমরা তো লেকের ধারে যাব। আর তাছাড়া আমরা তো নৌকা সফর করব না। তাহলে আলাদা টিকিটের ব্যাপার কীসের? ও যা বোঝাতে চাইল তাতে ঠিক বুঝতে পারলাম না ।

সামনেই রয়েছে একটি টিকিট কাউণ্টার। তবে আশেপাশে কোন লেক বা গাড়ি-নৌকো কিছুই দেখলাম না। টিকিট কাউন্টারটিও দেখে শ্রদ্ধা হল না। সরকারি নয়, মনে হল স্থানীয় কিছু ছেলে মিলে করেছে। ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বুঝতে গেলাম কাউন্টারে। যা বুঝলাম তা হল, এর বেশি ওরা যেতে দেবে না যদি না টিকিট কাটা হয়। টিকিট মাথাপিছু পঁচিশ ডলার। ওদের গাড়ি ছাড়া বাইরের আর কোনো গাড়ি এর বেশি যেতে পারবে না। তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে, এরপর গিয়ে নৌকোভ্রমণের সময়ও থাকবে না। অত চড়া দাম দিয়ে টিকিট নিয়ে লাভ নেই দেখে ফিরে আসছি তখন কাউণ্টারের বাইরে দাঁড়ানো একটি ছেলে বলল, আপনারা তিনজন আছেন, চলুন একটু সস্তা করে করে দেব। আমরা তা-ও যাইনি।

ফিরে এসে পড়াশোনা আর জিজ্ঞাসাবাদ করে যা জানতে পারলাম তা হল, টোনলা স্যাপ ১২০ কিমি লম্বা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সর্ববৃহৎ মিষ্টি জলের হ্রদ যা মেকং নদীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। অনেকটা আমাদের কাশ্মীরের ডাল হ্রদের সঙ্গে তুলনীয়। এখানেও হ্রদে অনেক গাছপালা পাখি মাছ এবং বহু লোকের বাস আছে। হ্রদের জলের ওপর নির্ভর করে জীবিকা অর্জন করে বহু মানুষ। অনেকেই খুবই দরিদ্র কিন্তু দারিদ্র্যও যে বিক্রি হয়, সেটাও একটা পণ্য তা এখানে এলে দেখা যায়। অবশ্য ভারতীয়রাও কম যাই না। আমাদের দেশে ভিক্ষাবৃত্তিও একটা এইধরণের ব্যবসা। বহু নেতা, ধনীমানুষ এই বৃত্তির পিছনে আছেন। কিন্তু রাষ্ট্র বা শাসকরা এটা জেনেও নিঃশব্দে চুপ করে থাকেন। এখানকার ব্যাপারটা হল, এরা অনেক দাম দিয়ে, পঁচিশ ডলার মাথাপিছু করে টিকিট কেটে এখান থেকে নিয়ে যায় এবং কিছুদূর নৌকায় নিয়ে যাবার পর বাধ্য করে আবার অন্য আর একটি নৌকায় যেতে, যার জন্য আবার টাকা দিতে হবে। অন্য সবকিছু দেখানোর সঙ্গে প্রধানতঃ

কায়দা। এটা কী করে দেখার জিনিস হতে পারে আমি জানি না। মানুষ পেটের তাগিদে নিজের দেহ বেচছে এতে দেশের গর্ব করার মত কী থাকতে পারে কে জানে!
যাইহোক এই দারিদ্র্য, যেটা এরা দেখায় তা সম্ভবতঃ সাজানো বা নকল। দর্শকদের কাছ থেকে যেভাবে ডলারে এর দাম আদায় করে তাতে এমনই প্রশ্ন জাগে। জলের ওপর গ্রামগুলোকে ওরা বলে ভাসন্ত গ্রাম। তবে জল অনেক জায়গাতেই নোংরা এবং খুঁটির ওপর বাড়িগুলোও হতশ্রী। ওরা প্রকৃতঅর্থে ভিক্ষা চায়, কেউ একটা পোষা সাপ বাচ্চার গলায় জড়িয়ে, কেউ বা বাচ্চাদের খাতা-পেন্সিল কিনে দেওয়ার কথা বলে, বা কিছু জিনিস কিনতে হবে বলে। যাতায়াতের জন্য ছোট ছোট নৌকা আছে এবং ছেলে-মেয়ে সবাই সে নৌকা চালানোয় পারদর্শী। হ্রদে বহু নৌকা পর্যটকদের শোষণ করার জন্য তৈরি হয়ে আছে। এখান থেকে নদীপথেও নমপেনে যাওয়া যায়। ছ ঘণ্টা লাগে। এই যে টোনলাস্যাপে ভ্রমণ, এটাকে যদি ঠিকমত সরকারি প্রচেষ্টায়, পরিচ্ছন্নভাবে গড়ে তোলা যায় তবে এটা পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে।
কাল একটু বেলায় যাব বাটাম্বাং।

~ ক্রমশঃ ~

অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংক আধিকারিক মলয় সরকার বর্তমানে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষদের শিক্ষা স্বাস্থ্য ও পরিবেশ উন্নয়নে বিশেষভাবে যুক্ত। এছাড়া পড়াশোনা ও লেখালিখি নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। নেশা দেশ-বিদেশ ভ্রমণ এবং উদ্যানচর্চা।

Comments

Name

Enter your comment here

Comment Add Image

Not using Html Comment Box yet?

No one has commented yet. Be the first!

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011-19 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu

বেড়ানোর ভাল লাগার মুহূর্তগুলো সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে ইচ্ছে করে, অথচ দীর্ঘ ভ্রমণকাহিনি লেখার সময় নেই? বেড়িয়ে এসে আপনার অভিজ্ঞতাগুলো যেমনভাবে গল্প করে বলেন কাছের মানুষদের - ঠিক তেমনি করেই সেই কথাগুলো ছোট্ট করে লিখে পাঠিয়ে দিন ছুটির আড্ডায়। লেখা পাঠানোর জন্য দেখুন এখানে। লেখা পাঠাতে কোনরকম অসুবিধা হলে ই-মেল করুন - admin@amaderchhuti.com অথবা amaderchhuti@gmail.com -এ।

শঙ্করপুরে একদিন

সৌমেন্দ্র দরবার

~ শঙ্করপুরের আরও ছবি ~

কর্মব্যস্ত জীবন। একটু বিরতি হলে মন্দ হয় না। রোজকার অফিসের দিনগত পাপক্ষয়, বসের লাল চোখ, সংসারের প্রাণান্তকর ব্যস্ততা কিংবা পড়শির পি. এন. পি. সি। কী দুর্বিষহ জীবন। মন চায় একটু ছুটি, একটু বিরতি – দু-তিন দিন! পুজোশেষে মাকে কৈলাসের পথে বিদায় জানিয়ে দীর্ঘ আট মাসের ঘরবন্দী জীবন থেকে মুক্তি পেতে ব্যাগ গুছিয়ে বেরিয়ে পড়লাম প্রকৃতির কোলে। মন চাইছিল বনানীর সবুজ, আকাশের নীল আর উত্তাল ঢেউ। যেখানে সমুদ্র আমাকে আলিঙ্গন করে বলবে "এসো মোর কাছে, একান্ত নিভৃতে," সবুজ ঝাউ হাত নেড়ে বলবে "অবগাহন করো মোর রূপ", নির্মল আকাশ কাছে ডেকে কইবে "ডানা মেলো খোলা হাওয়ায়, হে পথিক।"

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বেনফিশ-এর অতিথিনিবাস কিনারা। কলকাতা থেকেই অনলাইনে এ. সি. ঘর বুক করা ছিল। ছিমছাম, আপাত জীবাণুমুক্ত ঘরে খানিক বিশ্রাম নিয়ে গুটি গুটি পায়ে বেরোলাম প্রকৃতিকে নিরীক্ষণ করতে। সবুজের মধ্যে দিয়ে আঁকা বাঁকা রাস্তায় যেতে যেতে মন চলে গেল ছোট্টবেলার দিনগুলোতে। রাস্তার দুপাশে প্রজাপতি, মথ শরীর ছুঁয়ে অভিবাদন জানাচ্ছে। তাদের কত রং, কী বাহার! গাছের ডালে নাম না জানা পাখির কূজন মনকে নিয়ে যাচ্ছে কল্পলোকে। এরই মধ্যে হঠাৎ পায়ের সামনে কাঠবেড়ালি এসে প্রণাম ঠুকল, বুকটা ভোরে গেল গর্বে। দূরে ভোঁ বাজিয়ে ট্রলারেরা পাড়ি দিচ্ছে অতল সমুদ্রে। অন্বেষণ শেষ হলে ফিরে আসবে রুপোলি মাছের ডালি নিয়ে। স্থানীয় জেলেদের সারল্য মন কেড়ে নিল। এবার সমুদ্র অবগাহন। মনে হলো কত যুগ পর আবার হারিয়ে যাব অতলান্ত গভীরে। গা ভেজানোর আগে সবুজ ডাবের মিষ্টি জল তৃষ্ণাকে আরও বাড়িয়ে দিল। সাগরবেলায় ছোটদের বালিয়াড়ি আর ঝিনুক সংগ্রহ মনকে সত্যিই নিয়ে গেল শৈশবে। বালির ওপর অতি যত্নে লেখা নিজের নামকে সমুদ্র ভরিয়ে দিয়ে গেল ওষ্ঠের চুম্বনে। গায়ের ওপর সমুদ্রের মুহুর্মুহু আলিঙ্গন উপলব্ধি করতে করতে হারিয়ে গেলাম অন্যলোকে। সমুদ্রগাহনে পায়ের তলায় ছোট্ট ছোট্ট নুড়িগুলো এঁকে দিল আদরের রেখা। আদুল গায়ে লেগে রইল নোনতা তরল আর সাক্ষী রইল উন্মুক্ত নীল আকাশ আর একরাশ ঝাউ।

দ্বিপ্রাহরিক আহার সেরে নিদ্রাকে বললাম আজ তোমার ছুটি। আবার বেরিয়ে পড়লাম প্রকৃতি অন্বেষণে। মৎস্যবন্দরের অবিরাম কর্মব্যস্ততা, দুপুর রোদে মাঠের ধারে জেলেদের জালবোনা কিংবা সমুদ্রে নৌকা বাওয়া আর জাল টেনে তটে তোলা –সে যেন এক অন্য জগৎ। কুলিং টাওয়ারের অবিরাম জলধারায় সূর্যের আলোয় তৈরি রামধনু থেকে চোখ ফেরানো ভার। সময় গড়াতে লাগল। পড়ন্ত বিকেলে লাল পাথরের ওপর বসে সাদা ক্যানভাসে পেন্সিল ড্রয়িং আর ডায়েরির পাতায় দুকলম কবিতা লিখতে মন্দ লাগল না। রঙিন বিকেলে সূর্যের বাড়ি ফেরা তুলতে তুলতে ক্যামেরার স্টোরেজ ফুল হয়ে গেলে মনটা একটু খারাপ হল বটে কিন্তু পরক্ষণেই প্রকৃতি বলল কাল আবার এসো আমি থাকব তোমার অপেক্ষায়। ঝাউয়ের দোলায় দোল খেতে খেতে নির্জন সৈকতে ভ্রমণকালে গলায় গুনগুন করে উঠল "আমি দূর হতে তোমারে দেখেছি, আর মুগ্ধ হয়ে শুধু চেয়ে থেকেছি।"

সন্ধ্যার আলোঝলমল সমুদ্রতটে উষ্ণ চায়ের ভাঁড়ে চুমুক দিতে দিতে সান্ধ্যভ্রমণ স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে সমুদ্রের পাড়ে বসে শুক্লপক্ষের চাঁদের আলোয় রুপোলি ঢেউয়ের অবিরাম আস্ফালন অবলোকন করতে লাগলাম। বেশ কিছু সময় কাটিয়ে ফিরলাম অতিথি নিবাসে। সমুদ্রে এলাম অথচ আমার মতো মেছো মাছ খাব না তা কি করে হয় যেখানে মৎস্যবিলাসীদের রসনায় সামুদ্রিক জীবেরা সদা দন্ডায়মান। চিংড়ি ও ভেটকি সহযোগে রাতের আহার। ভোজন শেষ করে হোটেলের ম্যানেজারের সঙ্গে খানিক গল্পগুজব করে আবার বেরিয়ে পড়লাম রাতের রূপ পর্যবেক্ষণে। নৈশআহারের পর নির্জন সমুদ্রসৈকতে সমুদ্র গর্জন সে এক অন্য অভিজ্ঞতা। নির্জন, শান্ত আর গভীর। ঝাউয়ের বনে শুধু ঝিঁঝিঁদের শব্দ। প্রকৃতি যেন তার সবরকম নৈবেদ্য নিয়ে হাজির।

পরদিন সকালে আবছা আলোআঁধারিতে ধীরে ধীরে সূর্যদেবের আবার প্রত্যাগমন। সত্যি জীবনের জাঁতাকলে আর অজানা ভাইরাসের আক্রমণে কতদিন যে এমন ভোর দেখিনি! ক্যামেরার শাটার চলতেই থাকল। বন্দী হতে থাকল প্রকৃতির নানা রূপ। সমুদ্রের তটে বসে দেখতে থাকলাম দিনের শুরু, জেলেদের কর্মব্যস্ততা। দুপাশের বুনোফুলগুলো ধীরে ধীরে পাপড়ি মেলছে, নাম-না-জানা পাখির দল গাছে গাছে আড়মোড়া ভাঙছে। প্রকৃতি তার রূপের ডালি আবার ধীরে ধীরে মেলে ধরছে। আবার গতকালের রুটিনের রিপিট টেলিকাস্ট শুরু হয়ে গেল। শুধু ভোজনে ইলিশ আর পারসের আগমন। অনেকটা সময় বারান্দার অলিন্দে দাঁড়িয়ে প্রকৃতিরানিকে আস্বাদন করলাম। স্থানীয় মানুষদের সারল্য আর আন্তরিকতায় দুটো দিন যে কোথা দিয়ে চলে গেল বুঝতেই পারলাম না। এবার ঘরে ফেরার পালা। অমৃত না উঠলেও এ ভ্রমণের স্বাদ মিটিয়ে দিল মনের তৃষ্ণা। স্বাদ আর সাধ্যের মধ্যে শঙ্করপুর ভ্রমণ স্মৃতির ক্যানভাসে বন্দি হয়ে রইল।

~ শঙ্করপুরের আরও ছবি ~

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শারীরবিদ্যায় স্নাতকোত্তর ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট সৌমেন্দ্র দরবার বর্তমানে কলকাতার এক প্রখ্যাত ঔষধ প্রস্তুতকারক সংস্থার গবেষণা ও উদ্ভাবনবিভাগে সহকারীর প্রধান। দেশে ও বিদেশের বহু জার্নালে তাঁর গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে। কর্মব্যস্ত জীবন থেকে একটু ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন প্রকৃতির কোলে, অজানার সন্ধানে। কবিতাপাঠ ও লেখা তাঁর অন্যতম নেশা। ভোজনরসিক আর সংগীতপ্রিয় সৌমেন্দ্র ভালোবাসেন অবসরে মেয়ের সঙ্গে সময় কাটাতে।

ছোট্ট ছুটিতে দিঘায়

পঙ্কজ দত্ত

~ দিঘার আরও ছবি ~

দিঘা, কত মানুষের ভালোলাগা, ভালোবাসা। এক দুদিনের ছুটি পেলেই আর কোথাও যাওয়ার কথা মাথায় আসে না, আসে শুধু দিঘা। এমনই একটা আকর্ষণ যে যতবারই দিঘাতে যাওয়া হোক না কেন আবারও যেতে ইচ্ছে করে। একদিন হঠাৎ ঠিক করলাম যে দিঘা যাব। পরের দিন যেতে হবে, তাই, আনন্দে সারারাত ঘুম এলো না। ঘড়িতে ঠিক ভোর তিনটে বাজে। উঠে পড়লাম। এক টোটোওয়ালাকে বলে রেখেছিলাম যে ভোর চারটেতে এসে স্টেশন নিয়ে যেতে। ঘুমচোখে স্টেশনে পৌঁছলাম, তারপর ট্রেন ধরে চলে এলাম এসপ্ল্যানেডে। এসপ্ল্যানেড থেকে বাসে চেপে রওনা দিলাম দিঘার উদ্দেশ্যে। কী আনন্দ হচ্ছিল, উফফফ, মনে হচ্ছিল যাক দিনকয়েক একটু রেহাই পাওয়া যাবে দৈনন্দিন জীবন থেকে আর একটু মুখবদলও হবে। দিঘা পৌঁছলাম তখন দুপুর বারোটা। হোটেল আগে থেকেই বুক করা ছিল। উঠলাম নিউ দিঘাতে হোটেল আস্থা। এই হোটেলটা বিখ্যাত জাহাজ বাড়ির ঠিক উল্টোদিকে। পৌঁছে একটু ফ্রেশ হয়ে চা খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম সৈকতভ্রমণে। সমুদ্রে স্নান করে মজা পেলাম। স্নান করার পরে খুব খিদে পাচ্ছিল। দুপুরে খেয়ে একটানা ঘুম দিলাম। সন্ধেবেলা ঘুম থেকে উঠে একদম চনমনে লাগছিল। চলে গেলাম আবার সৈকতে। চা, ঝাল মুড়ি খেলাম। তারপরে রাতে ডিনার সেরে রেস্ট নিলাম হোটেলে।

পরের দিন ভোরবেলা উঠে গাড়িভাড়া করে গেলাম তালসারি। তালসারিটা কিন্তু দারুণ জায়গা। তালসারি ভ্রমণ করে ফেরার পথে ঢুকলাম চন্দনেশ্বর মন্দিরে। তারপরে সোজা চলে এলাম উদয়পুরে। স্নানটা সেরে ফেললাম সমুদ্রে। উদয়পুরে অনেকটা বিচ পাওয়া যায়। আবার স্নান করার আগে মাছভাজা খেতে ইচ্ছে হল। দেখলাম, কত দোকান আছে যারা মাছ, কাঁকড়া ভেজে দিচ্ছে। এক বয়স্ক মহিলাকে দেখে খুব কষ্ট হল। ভাবলাম এনার কাছেই খাই, অন্তত, কিছু পয়সা পাবেন। কাছে গিয়ে বললাম, ও মাসিমা, শুনছেন, কাঁকড়া ভাজা কত করে? আর মাছ ভাজা? দাম-দর ঠিক করে বললাম, আচ্ছা, আমাকে আমোদি ভেজে দিন এক প্লেট আর তারপরে কাঁকড়া দেবেন। তাই ভেজে দিলেন। আহা, কী বানিয়েছিলেন, অতুলনীয়। খেয়ে পয়সাকড়ি মিটিয়ে স্নান করে হোটেলে ফিরলাম। দুপুরে অল্পকিছু খেলাম। কারণ, উদয়পুরে অনেকটা ভাজা খেয়ে পেট ভরে গিয়েছিল। খেয়ে একটু আরাম করে বিকেলে চলে গেলাম অমরাবতী পার্ক আর তারপরে মেরিন মিউজিয়াম ওল্ড দিঘাতে। তারপরে ভাবলাম ওল্ড দিঘাতে যখন চলেই এলাম, নেহরু মার্কেট একটু ঘুরে দেখি। মার্কেট ঘুরে চলে গেলাম সোজা বিশ্ববাংলাতে। দারুণ বানিয়েছে বিশ্ববাংলাটা, আহা, দেখে মনে হচ্ছে বোধহয় বিলেতে চলে এসেছি। অনেকগুলো দোকানও আছে খাবারের। খেয়েদেয়ে ভাবলাম হেঁটেই চলে যাব। কিন্তু, তৎক্ষণাৎ মনে হল যে রাস্তা তো কম না ওল্ড দিঘা থেকে নিউ দিঘা পর্যন্ত, তার ওপর, চেনা জায়গা না, হেঁটে যাওয়াটা নিরাপদ হবে না। টোটো ধরে চলে গেলাম হোটেলে।

পরের দিন আবার গাড়ি বুক করে চলে গেলাম বিচিত্রপুর। বেশ অনেকটা রাস্তা। গিয়ে টিকিট কেটে বোটে উঠে পড়লাম। যাচ্ছি আর ভাবছি, কোথায় যে নিয়ে যাচ্ছে কে জানে! পৌঁছলাম একটা দ্বীপে। কী সুন্দর দ্বীপটা। তিন-চার ঘন্টা সেখানে কাটিয়ে রওনা দিলাম সোজা হোটেলের উদ্দেশ্যে। সেদিনটা আর কোথাও বেরোলাম না। পরের দিন সকালে উঠে গাড়ি ভাড়া করে চলে গেলাম মোহনায়। বাপ রে! মাছের কী বিদঘুটে গন্ধ। তার মধ্যে ছুটছে গাড়ি। আর থাকা যাচ্ছিল না। অবশেষে মোহনায় পৌঁছে স্বস্তি পেলাম। মোহনাতে বেশ কিছুক্ষণ কাটিয়ে একটু মাছের বাজারটা ঘুরে নিলাম। ততক্ষণে গন্ধটা সহ্য হয়ে এসেছিল। তারপরে ফেরত এলাম হোটেলে। এদিন অনেকক্ষণ স্নান করলাম সমুদ্রে। পরেরদিন অনেক স্মৃতি আর মানুষের ভালোবাসা নিয়ে ফিরে এলাম কলকাতাতে। ইচ্ছে রইল আবার যাব, আবার একটু রিফ্রেশমেন্ট হবে, আনন্দ হবে।

~ দিঘার আরও ছবি ~

হলদিয়ার আই ভি এল ধুনসেরি পেট্রোকেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিস প্রাইভেট লিমিটেডে কর্মরত পঙ্কজ দত্তের আগ্রহ ফটোগ্রাফি এবং অ্যাডভেঞ্চার ভ্রমণ। তাঁর কথায়, জীবনে বাঁচার জন্য যেটাই করতে হবে ভালোবেসে করতে হবে, তাহলেই জীবনের মজা পাওয়া যাবে। জীবন ভারী সুন্দর।

Comments

Name